দেবীকিশোরী

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা : বারো

তৃতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৩৬২

দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৫৫

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর : জিতেন্দ্রনাথ বসু

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

৩১, মোহনবাগান লেন,

কলিকাতা-৪

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই · বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত

শ্রীচরণকমলেষু

বীরাষ্টমী, ১৩৪১

এই লেখকের—

ভুলি নাই (২৫শ সং)
ওগো বধূ সুন্দরী (৩য় সং)
আগষ্ট, ১৯৪২ (৪র্থ সং)
বাঁশের কেল্লা (৪র্থ সং)
যুগান্তর (২য় সং
নবীন যাত্রা (৩য় সং)
জলজঙ্গল (২য় সং)
শ্রেষ্ঠ গল্প (৪র্থ সং)
বনমর্ম্মর (৪র্থ সং)
নবাঁধ (৪র্থ সং)
পৃথিবী কাদের ? (৩য় সং)
দুঃখ-নিশার শেষে (৩য় সং)
একদা নিশীথকালে (৪র্থ সং)
দেবী কিশোরী (৩য় সং)
উল্লু (২য় সং)
দিল্লি অনেক দূর
কাচের আকাশ
খদ্যোত (২য় সং)
বকুল (৩য় সং)
এক বিহঙ্গী (২য় সং)
সৈনিক (৬ষ্ঠ সং)
শত্রুপক্ষের মেয়ে (৪র্থ সং)
কুঙ্কুম (২য় সং)
কিংশুক
চীন দেখে এলাম ১ম পর্ব (৫ম সং)
চীন দেখে এলাম ২য় পর্ব (২য় সং)
সবুজ চিঠি
নূতন প্রভাত (৪র্থ সং)
প্লাবন (৪র্থ সং)
বিপর্যয়
রাখিবন্ধন

খুব রাতে রমা টিপি-টিপি ঘরে ঢুকিয়া দেখে, আলো নিভানো—কিন্তু হেমলাল জাগিয়া আছে। মশারি হাওয়ায় উড়িতেছে, বাহিরে পরিষ্কার জ্যোৎস্না···হেমলাল বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া বসিয়া চুরুট টানিতেছিল। রমার পায়ের শব্দে পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া একটু হাসিল।

তারপর অতিশয় সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাতে একখানা রেকাবি তুলিয়া ধরিল বধূর দিকে। রেকাবির উপর সবুজ মখমলের সুন্দর একজোড়া চটি।

রমা বলিল, জুতো ? কি হবে এতে ?

হাসিমুখে হেমলাল কহিল, গলায় দিতে হয়, জান না ?

মালা গেঁথে। তাই-ই উচিত। রমা ম্লানভাবে একটু হাসিল। একটু চুপ করিয়া কহিল, খবর শুনেছ ?

হেমলাল পুলকিত স্বরে কহিতে লাগিল, শুনি নি আবার! মা'র চিঠি, তোমার চিঠি একদিনেই পাই। সেই থেকে আসবার জন্য ছটফট করছি। বড়বাবুটাও হয়েছে তেমনি পাজি—এ-হপ্তায় নয় ও-হপ্তায় নয় করতে করতে এই তিন মাস।···ওঃ রমা, কি যে ভয় হয়েছিল, ভালয় ভালয় হয়ে গিয়েছে খুব রক্ষে—

স্বামীর স্নেহভরা কথায় রমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। হেমলাল বলিতে লাগিল, স্টেশনে টিকিট কিনে তারপর মনে হল, তাইতো একটা কিছু নিয়ে যাওয়া তো উচিত। সামনের মাথায় এক জুতোর দোকান—তাই সই। নাও, তোমার বকশিশ নাও গো—

বলিয়া হাসিয়া জুতাজোড়া আগাইয়া ধরিল।

রমাও হাসিতে গেল, হাসিতে গিয়া ঝর-ঝর করিয়া চোখের জল পড়িল। হেমলালের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

চোখ মুছাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, মেয়ে হয়েছে বলে কোন কথা হয়েছে বুঝি,—সত্যি কথা বল রমা, কেউ কিছু বলেছেন।

রমা ঘাড় নাড়িল।

হেমলাল বুঝাইতে লাগিল, ওতে দুঃখ করতে নেই। সকলের মনের অবস্থাটা একবার বোঝ। বাড়ির মধ্যে আট-আটটা মেয়ে। এক অনুপমার বিয়ের দেনা এখনো সামলে ওঠা যায় নি। বৌদিদের কারো ছেলে হল না একটা। মা এবার বড্ড আশা করেছিলেন; ডেকে-হেঁকে বলতেন সবাইকে, দেখো ছোট বৌমার আমার—। কেন, তোমার সামনেই তো কতদিন।

রমা বলিল, হ্যাঁ!

তবে দেখ। রাগ করা কি উচিত?

রমা বলিল, রাগ কিসের? রাগ অদৃষ্টের উপর। মা বলেছিলেন, ছোট বৌমারও যদি মেয়ে হয় আমি ঠিক কাশী চলে যাব। সত্যি সত্যি যখন তাই হল, শুনলাম কেঁদে ফেলেছিলেন। আমি তাই দিন-রাত ষষ্ঠীর পায়ে মনে মনে মাথা খুঁড়েছি, সেই বড় যন্ত্রণার সময়েও ষষ্ঠীতলার দিকে কতবার যে প্রণাম করেছি—

হেমলাল জিজ্ঞাসা করিল, বোধকরি দুষ্টামি করিয়া, কোন সময়ে?

এ সব কথা বলিয়া ফেলিয়া রমা একেবারে রাঙা হইয়া গিয়াছে। বিষণ্ণ মুখের উপর হাসি ফুটিল। হেমলালের স্বরের অনুকৃতি করিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, কোন সময়ে? আমি জানি নে—যাও—

হেমলালের মন জুড়াইয়া গেল। বধূকে টানিয়া জোর করিয়া সে পাশে আনিয়া বসাইল। বলিল, যাকগে বাজে কথা। তোমার সে ষষ্ঠীর ধন কোথায় লুকিয়ে রেখে এলে বল দিকি? আন তাকে—দেখব।

বলিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নার আলোয় রমার দিকে চাহিয়া রহিল। বলিতে লাগিল, স্টেশন থেকে যখন বাড়ি আসি ষষ্ঠীতলায় খুব সুন্দর চাঁপার গন্ধ পেলাম। জুতো খুললাম, রাত্রে আর তোমার ষষ্ঠী-ঠাকরুন ঠাহর করতে পারবেন না—ভাবলাম, ভিতরে গিয়ে নিয়ে আসি গোটাকতক ফুল। শেষ পর্যন্ত সাহস হল না সাপের ভয়ে। কেমন হত বল দিকি, এই এখানে এখানে এখানে সব ফুল গুঁজে দিতাম—

রমা শিহরিয়া জিভ কাটিল।

ওমা, ওকি কথার ছিরি তোমার? ঠাকুর-দেবতা নিয়ে খেলা? না না—অমন সব বলতে নেই, গড় কর—

বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া নিজেই তাড়াতাড়ি অসম্মানিত অদৃশ্য দেবীর উদ্দেশে নমস্কার করিল।

বাড়িটার পশ্চিমে আম-কাঁঠালের পুরানো বাগিচা। সেটা ছাড়াইয়া গাঙের ঠিক উপরে ঘন বেত ও আগাছার ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া বহু কালের একটি অশ্বত্থগাছ—গাছ সেটাকে বলা উচিত নয়—এবং কেবল শুধু ঐ অশ্বত্থটি নয়, উহার চারিপাশে ছায়াচ্ছন্ন ভাঁট-কালকাসুন্দেগুলিও নাকি এই রকম যে, একখানা ডাল ভাঙিলে তাহারা অবিকল কচি শিশুর মত কাতরাইয়া উঠিবে। দেশের দিনকাল বদলাইয়া যাইতেছে—এই লইয়া এখন কেহ কেহ ঠাট্টাবিদ্রূপ করে, কিন্তু এ অঞ্চলের বাইশখানা গ্রামের মধ্যে কোন দুঃসাহসী আজও কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই।...ঐ অশ্বত্থতলে নির্জন গ্রামসীমায় কতকাল হইতে ষষ্ঠীদেবী তাঁর লক্ষকোটি সন্তান কোলে-কাঁখে লইয়া সংসার পাতিয়া আছেন। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া ষষ্ঠীর পূজা দিতে হয় না, বেশি মানুষজন সেদিকে যায় না, যাহাদের বয়স পারাইয়াও সন্তান হয় না কিম্বা যে আনাড়ি কিশোরীরা মাতা হইয়া হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, ষষ্ঠী তাহাদেরই দেবতা।

স্টেশনের রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়াছে সরু একটি পায়ে-চলার পথ—একজন মানুষ কোন রকমে অনেক কষ্টে কাপড় বাঁচাইয়া ঢুকিতে পারে, জঙ্গল কাটিয়া যা কেহ করিয়া দেয় নাই। সুখে-দুঃখে গৃহিণীরা বধূ ও কন্যাদের লইয়া ঐ পথে বৃক্ষদেবতার কাছে মানত করিতে যান, সেকালের বুড়িরাও অমনি সেকালের বধূদের লইয়া যাইতেন, গ্রামের পত্তন হইতে এমনি চলিয়া আসিতেছে। শত শত বৎসর ধরিয়া গ্রামলক্ষ্মীদের পায়ে পায়ে ঐ সঙ্কীর্ণ পথটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে।

খুব জাগ্রত দেবী এই ষষ্ঠীঠাকরুন—অসীম তাঁহার করুণা। তুমি অভুক্ত থাকিয়া পবিত্র মনে যদি আঁচল পাতিয়া পড়িয়া থাকিতে পার, অশ্বত্থের একটি পাতা নিশ্চয় তোমার আঁচলে পড়িবে। পাতাটি মাথায় ঠেকাইয়া যত্ন করিয়া তুলিয়া আনিও।

যাহাদের নূতন ছেলে-মেয়ে হইয়াছে, দিনে রাতে সবসময় ষষ্ঠী তাহাদের বাড়ি আনাগোনা করেন। ছেলে কাঁদিয়া উঠিলে শিয়রে আসিয়া বসেন, ঘুমাইলে তাহার সহিত কত কি কথাবার্তা কহিতে থাকেন, শিশুর বিপদ-আপদ সব সময় পাহারা দিয়া ঠেকাইয়া বেড়ান। যতদিন ছেলে বড় না হয় ঠাকরুনের আর সোয়াস্তি নাই।

সর্বমঙ্গলা ষষ্ঠীঠাকরুন—তাঁর সম্বন্ধে কোন রকম অসম্ভ্রমের কথা বলিতে নাই।

রমা প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল, অপরাধ নিও না দেবী, ছেলেপিলের অমঙ্গল না হয়—।

স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, তোমার বড্ড আধিক্যেতা। আর বোলো না কক্ষণো। বুঝলে ?

হেমলাল বলিল, মেয়ে দেখব কখন? বকশিশটা আগামই দিলাম। দেখি, জুতো পায়ে হল কিনা—

হাসিয়া রমা কহিল, বকশিশ বরঞ্চ কাল মা'র হাত দিয়ে দিও—পায়ে নয়, তিনি পিঠের উপর ঝাড়বেন।

কি যে বল, ছি-ছি—হেমলাল আদরে বধূকে আবার টানিয়া আনিল। বলিতে লাগিল, বাড়িসুদ্ধ সবাই বুঝি হেনস্থা করে? আমি কিন্তু একবিন্দু দুঃখিত হই নি। ভগবান যা দিয়েছেন, তাই ভাল। কিন্তু মা জুতো মারতে পারেন, সত্যি সত্যি তুমি বিশ্বাস কর রমা? ঘরের লক্ষ্মী তুমি—এসব ভাবলেও যে পাপ হয়।

আর আমার বুঝি পাপ হয় না মশাই, যখন তখন আমার পায়ে হাত দেবে—

হেমলাল কথা বলিতে বলিতে কখন অলক্ষিতে পায়ে জুতা পরাইয়া দিতেছিল, রমা টের পাইয়া চমকিয়া পা গুটাইয়া লইল। বলিতে লাগিল, মাগো, কি দুষ্টু তুমি, আমায় ভালমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এদিকে জুতো পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।—না—না—না—

বলিয়া ছেলেমানুষের মতো মাথা নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া দৌড় দিল।

প্রথমে গিয়া বসিল, দূরের একটা চৌকিতে। সেটাও তেমন নিরাপদ নয় দেখিয়া খাটের ঠিক মাঝখানে বিছানার উপর পা দু'খানি শাড়ির মধ্যে আচ্ছা করিয়া ঢাকিয়া আটিয়া সাটিয়া অনড় হইয়া বসিল।

দেখি, আহা ও রমা, একটুখানি সরেই বোস না ছাই—

রমার সহিত জোর-জবরদস্তি করিয়া এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাহারও পারিবার জো নাই। হেমলাল অতঃপর রীতিমত অনুনয়-বিনয় আরম্ভ করিল।

শোন লক্ষ্মীটি, আমার বড্ড ইচ্ছে হয়েছে···শুনবে আমার কথা?

এই একটা সামান্য কথা তো মোটে—লোকে স্বামীর জন্য কত কী করে থাকে –

অবশেষে হেমলাল গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

বাতাসে নৌকার পালের মতো মশারি উড়িতেছে। এতবড় গ্রামখানির কোথাও একবিন্দু সাড়াশব্দ নাই। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া উঠানের দিকে একপাল শিয়াল ঝগড়া বাধাইয়া খ্যাঁক-খ্যাঁক করিয়া উঠিল।

দু'জনেই চমকিয়া তাকাইল। রমা বলিল, শেয়ালের কি ভয়ানক দৌরাত্ম্য হয়েছে, দিনদুপুরেও এইরকম করে, মানুষ-জন কিচ্ছু মানে না। আমি খুকিকে নিয়ে আসিগে। মা'র কাছে রয়েছে, আলগা ঘর—তিনি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন এতক্ষণ—

হাত ধরিয়া রাগতভাবে হেমলাল কহিল, তার আগে শুনবে না আমার কথা ?

না—বলিয়া জেদ করিয়া রমা দাঁড়াইল। বলিল, জুতো আমি নিজে পরতে জানি—দাও আমায়। এ কেমনধারা বিদঘুটে শখ ? শেষকালে যমদূত এসে নরকে নিয়ে যাক—বলবে, স্বামীকে দিয়ে যেমন জুতো পরিয়ে নিয়েছিলি হতভাগী—

পাপ হবে না বলছি, তবু এক কথা একশবার—

রমা ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার মুখে হাত চাপা দিল।

ওগো আস্তে। ওই ওখানে মা ঘুমুচ্ছেন—তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই একটু ?

হাত সরাইয়া শান্তকণ্ঠে হেমলাল কহিল, পা যদি তুমি না বের কর, আমি চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলব। মাকে ডেকে তুলে বলব, মা আমাকে লাথি মেরেছে।

এত বড় সত্যিকথা বেরুবে মুখ দিয়ে ?

সত্যি হোক, মিথ্যে হোক—বলবই, যদি আমার কথা না শোন।

রমা বলিল, তাই কোরো। তাতে খুব সুখ্যাতি বেরুবে। মা ভাববেন, বৌ আর ছেলে কি ধনুর্ধর হয়েছে আমার!

শুনবে না তবে? ওমা, মাগো—হেমলালের কণ্ঠ ক্রমেই উচ্চে উঠিতে লাগিল।

ভীত রমা তাড়াতাড়ি পা বাহির করিয়া দিল। রাগ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একেবারে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল।

হেমলাল ইতস্তত করিল, এই অবস্থায় এখন আর ঘাঁটাইবে কি না। জুতাজোড়া হাতে তুলিতেই দেখিল, না—না—ব্যাপার যা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, রমা আড়চোখে তাকাইতেছে, মুখে কৌতুকের দীপ্তি। দুই হাতে জোর করিয়া তার মুখ ফিরাইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, শোন রমা, কি রকম জেদি তুমি! পাপই যদি হয়···বেশতো আমি কথা দিচ্ছি যতখানি খুশি আমার পায়ের ধূলো নিও—আমি কোন আপত্তি করব না।

জুতা পরিতেই হইল, উপায় কি?

বধূর আপাদ-মস্তক সগর্বে বারকয়েক চাহিয়া হেমলাল বলিল, কেমন মানিয়েছে দেখ তো!

মুখ বাঁকাইয়া তাচ্ছিল্যের সুরে রমা বলিল, ছাই—

হেমলাল বলিল, তা বই কি! তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা—এ দেখবার ভাগ্যি থাকা চাই—বুঝলে? আয়নায় দেখে এসে বোলো তারপর। সত্যি রমা, আমি ভাবি অনেক সময়, কত বড় ভাগ্যবান যে আমি—

রমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুচ্ছো করতে হবে না--ঘুম পায় না তোমার? রাত যে কত হল—

হেমলাল কহিল, অত বড় পাপের বোঝা তোমার কাঁধে চাপিয়ে ঘুম আসে কি করে? প্রণাম করে পাপটা আগে খণ্ডন কর, আমি দাঁড়িয়ে আছি।

স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া রমা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

হেমলাল তখন ডান হাত তুলিয়া রীতিমতো আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াছে। বলিল, এসো, এসো—নববস্ত্র নতুন জুতো এই সব পরলে গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়।

রমা ফিক করিয়া হাসিয়া আবার খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, না, আমি পারব না—ওরকম করলে আমি কক্ষনো···ইঃ, ভারি একেবারে আচার্য ঠাকুর হয়েছেন—

হেমলাল অধীর হইয়া উঠিল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধরল যে—

এসে শোও না তুমি।

বেশ, আমার দোষ নেই। বলিয়া হেমলাল খাটের উপর বসিল। বলিল, কিন্তু ভাল করলে না রমা, যমদূতগুলো কি রকম গরম তেলের পিপেয় করে জ্বাল দেয়, পটের ছবিতে দেখেছ তো? মেয়ে আনো এবার।

রমা যেন খুকীকে আনিতেই ও-ঘরে যাইতেছে এমনিভাবে দোরের দিকে মুখ করিয়া উঠিল। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া চট করিয়া স্বামীর পা ছুঁইল এবং সেই হাত নিজের মাথায়। হেমলাল হাসিয়া কি বলিতে গিয়া দেখিল, রমা ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

সাদা জ্যোৎস্নায় মেজের উপর খাটের ছায়া, জানালার গরাদের ছায়া, দোলনার ছায়া, শিকার উপর সাজানো হাঁড়ি-মালসার ছায়া ঘরময় যেন চিত্র-বিচিত্র আলপনা দিয়া গিয়াছে। রমা মেয়ে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

হেমলাল দেশলাই ধরিয়া যতবার দেখিতে যায়, কাঠি বাতাসে নিভে।

রমা বলিল, আলোটা জ্বালই না গো। ঘর অন্ধকার করে বসে আছ—আচ্ছা লোক! আমার তো গোড়ায় ঘরে ঢুকতেই সাহস হচ্ছিল না।

হেমলাল বলিল, কি মনে হচ্ছিল বল দিকি? ভূত? যেন একটা ভূত এসে তোমার খাটের উপর বসে চুরুট টানছে—না?

রমা বলিল, গোয়ালঘরে সন্ধ্যে দেখিয়ে এক পিদ্দিম তেল দিয়ে রেখে গেছি, বেশ দিব্যি তা নিভিয়ে বসে আছ।

শুধু শুধু তেল পুড়বে কেন?

বড্ড যে পয়সার উপর দরদ!

প্রদীপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হেমলাল মেয়ে দেখিতেছিল। জবাব দিল, হবে না? এখন থেকেই বুঝে-সমঝে চলতে হবে। এখন আর সেদিন নেই, এখন আমি—

বলিতে বলিতে গর্বিত ভঙ্গিতে রমার দিকে চাহিল।

রমা বলিল, হ্যাঁ, দিগ্‌গজ হয়েছে।

ঘুমন্ত মেয়ে ন্যাকড়ার মতো বিছানার গায়ে লাগিয়া আছে। আরও খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া হেমলাল বলিল, কিন্তু এ যে স্বয়ং মহাকালী নেমে এসেছেন। উপায় কি হবে বল তো?

রমা মেয়ের দু'পাশে দু'টি পাশবালিশ দিয়া পরম স্নেহে গায়ের উপর কাঁথা টানিয়া দিল। বলিল, তোমাদের চেয়ে ঢের ফর্শা···আর বলতে হবে না—যাও, যাও।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিল, তোমরা কেউ ওকে দেখতে পারবে না, আমি তা জানি। আমি তাই এখন থেকে—

গলায় যেন কি আটকাইয়া কথা থামিল। অবনত মুখে একাগ্রে মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

হেমলাল প্রশ্ন করিল, এখন থেকে কি—বললে না?

ঘাড় নাড়িয়া রমা বলিল, আমি যদি না বলি—

বলো, বলো—

বলছিলাম যে পিদ্দিমটা নেভালে কেন ?

বাতাসে আপনি নিভেছে। কিন্তু ও তো বাজে কথা—

খোঁপার পাশে ক'গোছা আলগা চুল উড়িতেছিল, খপ করিয়া তাই ধরিয়া হেমলাল দিল এক টান। বলিতে লাগিল, বড্ড ইয়ে হয়েছ, কথা ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কেমন ?

আঃ, লাগে লাগে—বলছি—। বলিতে বলিতে শাস্তির যন্ত্রণায় রমা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আমি এখন থেকে খুকির বিয়ের পয়সা জমাচ্ছি, মেয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাদের।

বটে ? কতগুলো হল ?

মোটে তিন-চারটে।

রমা খুব হাসিতে লাগিল। বলিল, ও আমি পারি নে। একদিন একখানা বই পড়ে ভয়ানক সঙ্কল্প করে বসলাম, রোজ একটা করে পয়সা জমাব। দিন পাঁচ সাত বেশ চলল, শেষে একদিন দু'দিন কখনো বা তিন দিন বাদ পড়ে যায়। খুলে দেখি বিস্তর জমেছে। তখুনি রূপহলুদ ব্রতের সিঁদুর কিনতে দিলাম। এখন এই তিন-চারটে আছে হয়তো—

সেদিনের সেই জ্যোৎস্নামগ্ন রাত্রিটি নিভৃত গ্রামপ্রান্ত দিয়া কত শীঘ্র কেমন করিয়া উড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তোমরা যাহারা সব ঘুমাইয়া ছিলে—কিছুই তাহা জানিতে পার নাই। দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিমে গাঙ-পারে ঢলিয়া পড়িল, ঝটপট করিয়া বাদুড়ের ঝাঁক ফিরিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে উঠানের বাতাবিলেবু গাছটি আবছা আঁধারে রহস্যাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আর একপাশে মেয়ে ঘুমাইয়া। প্রদীপের আলো কাঁপিতেছে। রমা ও হেমলাল পাশাপাশি বসিয়া আছে।

খুকী আবার কাঁদিতে লাগিল। এ ঘরে আসিয়া আরও দু'তিন বার কাঁদিয়া উঠিয়াছে। এবারে বড় ভয়ানক কান্না, রমা কিছুতে শান্ত করিয়া উঠিতে পারে না।

হেমলাল বলিল, এ যে রূপকথার সূতোশঙ্খ সাপ। ঐ তো সূতোর মতো একফোঁটা মানুষ—অত বড় শাঁখের আওয়াজ বেরুচ্ছে কি করে? মেয়ের যেমন রূপ, গুণও তেমনি—

রমা বলিল, মেয়ে দেখতে মন্দ নয় গো, কালকে দিনমানে দেখো। এখন তুমি শুয়ে পড়।

হেমলাল মনের বিরক্তি সামলাইতে পারিল না। বলিল, শুয়ে কি হবে? সমস্ত রাতের মধ্যে আজ চোখ বুজতে দেবে না। এসে অবধি কেবল কাঁদছেই—একটাবার হাসতে দেখলাম না—

আচ্ছা তুমি ঘুমোও। আমি বাইরে নিয়ে শান্ত করছি।

বলিয়া বিবর্ণমুখে রমা মেয়ে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

চারিদিকে বেশ রোদ উঠিয়া গিয়াছে, হেমলাল সেই সময়ে চোখ মেলিল। দেখে, নিচে মেজের একপাশে খুকী ঘুমাইয়া আছে। রাত্রির অভিমানের একফোঁটাও রমার মুখে লাগিয়া নাই। হাসিমুখে রমা ডাকিতে লাগিল, দেখ, ওগো দেখসে একবার—। ঘুমন্ত মেয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সগর্বে রমা স্বামীকে দেখাইতে লাগিল, কত মাণিক ঝরছে ঐ দেখ—তুমি যে বলছিলে মেয়ে হাসতে পারে না···

আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু শিশু যখন ঘুমায় ষষ্ঠীদেবী শিয়রে আসিয়া বলেন, খুকী, তোর মা মরেছে রে···। খুকী দেখে, মা যে তাহার পাশেই রহিয়াছে। দেবীর দুষ্টামী ধরিতে পারিয়া খুকী হাসিয়া ওঠে।

হাসিতে হাসিতে আবার দেখা যায়, খুকী কাঁদিয়া উঠিল।

ষষ্ঠীদেবী তখন বলিতে থাকেন, মা নয়, ও খুকী, মরেছে তোর

বাবা···। বাবাকে খুকী কোন দিকে না দেখিয়া বাবার জন্য ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

দেবী আবার বলেন, ঐ তোদের ঘরে আগুন লাগল রে খুকী। সঙ্গে সঙ্গে খুকী চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া পড়ে···

যতদিন ছেলেমেয়ের কথা না ফোটে, দেবী তাহাদিগকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া খেলা দিয়া বেড়ান। কথা বলিতে শিখিলে আর তিনি দেখা দেন না, পাছে কারও কাছে তাঁর কীর্তি-কথা প্রকাশ করিয়া দেয়।

মেয়ে জাগিয়া উঠিয়াই কাঁদিতে লাগিল। রমা অপরাধীর মতো তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আমি ও ঘরে নিয়ে যাচ্ছি—

বলিয়া ভয়ে ভয়ে স্বামীর দিকে তাকাইল।

হেমলাল হাসিয়া বলিল, রাতে ঘুমের সময় যতটা রাগ হয় এখন অবশ্য তেমন হবে না। কিন্তু আমি ভাবছি রমা, মেয়ে কাঁদুনে হলে কি করে চলে? এ বাড়িতে মেয়ের কিছু কমতি নেই যে কাঁদলে অমনি 'ষাট্ ষাট্' করে বিশ-পঁচিশ জন কোলে তুলে নাচাবে।

রমা বলিল, এমন তো কাঁদে না, ওর হয়তো পেট কামড়াচ্ছে। এত সাবধানে আছি আমি, একবেলা করে খাই, সর্বদা টিক-টিক করে বেড়াচ্ছি, তবু হয়তো কিসে কোন অত্যাচার হয়েছে··· ভোরবেলা মা তাই বকাবকি করছিলেন, আমাকে বলছিলেন, রাক্কুসি—

বলিতে বলিতে অধোমুখে মেয়ের দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিল।

হেমলাল বলিল, কিন্তু তোমার খাওয়ার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কটা কি?

ও আমার দুধ খায়।

হঠাৎ হেমলাল রমার মুখ তুলিয়া ধরিল। রমা মৃদু হাসিয়া বলিল, দেখছ কি? রাত জেগেছি—তাই অমনি। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি তারপর সমস্ত রাত ওকে নিয়ে রোয়াকে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। সকাল হয়ে গেলে তবে চুপ করল। মা মিথ্যে কিছু বলেন নি—খাওয়ার কি অত্যাচার হয়ে থাকবে। আহা, কথা বলে বুঝিয়ে দিতে পারছে না—কি কষ্ট হচ্ছে দেখ তো বাছার!

আবার কি কাজে এ ঘরে আসিয়া হেমলালের সহিত দেখা হইল।

রমা বলিল, একটা সত্যি কথা বলবে?

হেমলাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

কাল বলছিলে, মেয়ে হয়েছে বলে তুমি দুঃখিত হও নি। খুকীকে দু'চক্ষে কেউ দেখতে পারে না, ও বড্ড অভাগী···তুমি বলছিলে তুমি মোটেই দুঃখিত হও নি—

বলিয়া রমা ম্লান হাসি হাসিল।

হেমলাল বলিল, দুঃখ করে আর করব কি বল? ভগবান যা দিলেন তা মেনে নেওয়াই উচিত।

মুখ দেখে মায়া হয় না তোমার? রমা স্বামীর দিকে দু'টি চোখের আকুল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, আচ্ছা, কি মনে হয় বল, তোমার কি ইচ্ছে হয়—ইচ্ছে হয় যে ওর ভালমন্দ হয়ে যাক কিছু? চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল, অনেক কষ্টে কোন রকমে সে কান্না ঠেকাইল।

হেমলাল বলিল, কাল সমস্ত রাত ঘুমোও নি, তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে রমা,। যাও, নেয়ে ফেলগে। তারপর দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও—

হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া রমা বলিতে লাগিল, তোমরা সব এক

রকমের, আমি জানি—জানি। এই আমার জুতো এল, হেন-তেন কত ছাইপাঁশ আসে, ওর নাম করে আনলে কিছু? সিকি পয়সা দামের একটা কিছু—পারলে আনতে?

হেমলাল কহিল, মনে ছিল না। নিয়ে আসব এইবার।

আনতে হবে না তোমার। ও চায় না তোমাদের ভিক্ষের দান—আমি ওকে নিয়ে যেখানে হয় চলে যাব একদিকে।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

শাশুড়ীর মধুর কণ্ঠ পূবের ঘর হইতে ভাসিয়া আসিল, অ বৌমা, ইদিকে এসো বাছা, কুলের চেরাগ আবার জেগে উঠেছেন—পিণ্ডি গিলিয়ে যাও—

দুপুরে হেমলাল পাড়ায় বাহির হইয়াছে, রমা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, হেমলাল রাগ করিয়া খুকীকে যেন লাথি মারিয়া হন-হন করিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া খুকীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। খুকী বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। ক্রমে বেলা গড়াইয়া আসিল।

আবার রমা স্বপ্ন দেখিল, লাল চেলি-পরা হাসি হাসি মুখ এক কিশোরী খুকীকে কোলে লইয়া বলিতেছে, রমা, নিয়ে চললাম তোর মেয়েকে। এ বাড়ির কেউ ওকে দেখতে পারে না, এখানে থেকে মেয়ে শুকিয়ে দড়ি হয়ে যাচ্ছে—

রমা যেন বলিল, কাল থেকে বড্ড কাঁদছে ভাই, মোটে দুধ খাচ্ছে না। কি যেন হয়েছে—

কই? কি হবে আবার? বলিয়া কিশোরী মেয়ে তুলিয়া দেখাইল। কোলের মধ্যে পুটপুট করিয়া খুকী তাকাইতেছে, রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। ছোট্ট ছোট্ট হাত মুঠা করিয়া গালে দেওয়া

হাত সরাইয়া দন্তহীন মাড়ি মেলিয়া খুকী হাসিতে লাগিল। কান্না কোথায় ?

এসো, আমার সোনা এসো—বলিয়া হাত বাড়াইয়া রমা কোলে লইতে গেল। খুকী লাল চেলির আড়ালে মুখ সরাইল। কিশোরী বলিল, ও আর তোমার কাছে যাবে না বোন, আমি ষষ্ঠীঠাকরুন—ওর কষ্ট দেখে থাকতে পারলাম না, নিয়ে যেতে এসেছি···

বলিতে বলিতে মেয়ে লইয়া দেবী কিশোরী যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল। রমার ঘুম ভাঙিল। ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখে, কোল খালি—সত্যই খুকী তাহার নাই।

সামনেই হেমলাল। অস্বাভাবিক উত্তেজিত কণ্ঠে রমা জিজ্ঞাসা করিল—খুকী ? আমার খুকী কোথায় গেল ?

হেমলাল কিছু বুঝিল না। বলিল, তা কি করে বলব, আমি তো এই আসছি—

রমা ছুটিয়া একেবারে কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল, লুকিয়ে রেখেছ না কি ? ঠাট্টা কোরো না—সত্যি বল। আমি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি—কেউ নিয়ে গেছে নাকি ?

হেমলাল কহিল, মা হয়তো নিতে পারেন। দেখ জিজ্ঞাসা করে।

মাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, মেয়ে আমার তিন কুল উদ্ধার করবে, তাই লুকিয়ে রেখে সোহাগ করছি।

বাড়ির প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কেহই কিছু জানে না। খুব খোঁজাখুজি শুরু হইল। উদ্বেগ-কম্পিত স্বরে হেমলাল বলিল, শেয়ালে নিয়ে যায় নি তো ? আমি এসে দেখলাম, একা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে, দুয়োর খোলা হাঁ-হাঁ করছে—

রমা মুখ গুজিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। শিয়ালের দৌরাত্ম্যের

নানা ঘটনা বহুজনে বলিতে লাগিল। তখন ঘর-দোর ছাড়িয়া আশ-পাশের জঙ্গল নাটাবন বাঁশতলা প্রত্যেক সন্দেহজনক স্থান—কোথাও খুঁজিতে বাকি রহিল না। রমার কাছে আসিয়া হেমলাল বসিয়া পড়িল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলিল, সত্যিই বুঝি সর্বনাশ হয়ে গেছে রমা—

রমা মুখ তুলিতে গিয়া স্বামীর সে দৃষ্টি সহিতে পারিল না।

বলিল, আমায় ফাঁসি দাও—ফাঁসি দাও—আমি হতভাগী মেয়েকে যমের মুখে দিইছি।

দুই হাতে মুখ চাপিয়া দ্রুতপদে রমা উঠিয়া গেল।

আলুথালু শোকাচ্ছন্ন বেশে সে ছুটিল। ছায়ান্ধকার আমবাগানের মধ্যে কেহই লক্ষ্য করিল না, ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার উপর গিয়া পড়িল। সাড়া পাইয়া ভাটবনের দিক হইতে ক'টা শিয়াল পলাইয়া গেল। আর রমার সন্দেহমাত্র রহিল না। এইখানেই তাহার খুকী পড়িয়া আছে, কাল রাত্রি হইতে বড় কান্না কাঁদিতেছিল—কাঁদিয়া আর সে জ্বালাইবে না। বেত ও বৈঁচির কাঁটা ঠেলিয়া পাগলের মতো রমা সেই অপরাহ্নের আবছা অন্ধ কারে বিরাট সহস্র-বাহু অশ্বত্থের মূলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল।

ও ষষ্ঠীঠাকরুন, আমার খুকীকে ফিরে দাও।

তারপর ঘন ছায়ায় অস্পষ্ট ঝুরির ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল, উপর হইতে আকাশভেদী ডালের এখানে ওখানে কোটরের মধ্যে ষষ্ঠীদেবীর লক্ষ-কোটি ছেলেমেয়ে সব তাহাকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। বাতসে ভাটবন দুলিতে লাগিল। উগ্র কটুগন্ধ···পাতার খস-খস শব্দ···যেন কত লোক চারিপাশে নিঃশব্দে চলাফেরা করিতেছে। সেইখানে সেই ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া মাথা কুটিয়া কুটিয়া রমা কাঁদিতে লাগিল, আমার খুকী কোথায় আছে ? বলে দাও দেবী, বলে দাও—।···ঝুর-

ঝুর করিয়া অশ্বত্থের পাকা পাতা পড়িয়া তলা ছাইতে লাগিল। কতক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া আবার সে পাগলের মতো বাহির হইয়া আসিল।

হেমলাল খুঁজিতে আসিতেছিল। বলিল, কোথায় গিয়েছিলে? খুকী যে তোমার কেঁদে খুন হচ্ছে—

ঘরের মধ্যে অতি মধুর কান্নার আওয়াজ। ব্যাকুল আগ্রহে ঘরে গিয়া রমা ক্রন্দনরতা মেয়েকে বুকে লইল, অশ্রুচোখে হাসিয়া উঠিল। বলিল, কোথায় পেলে?

মনোরমা নিয়ে গিয়েছিল।

মনোরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, আচ্ছা ঘুম তোর বউদি, এত ডাকাডাকি—কিছুতে সাড়া নেই। মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেলাম, তবু টের পেলি নে। একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় তোকে চুরি করে নিয়ে যাব।

হেমলাল রাগের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, খবরদার! আজ তোর বৌদিকে কাঁদিয়ে বেড়ালি সারা বিকাল, আবার একদিন আমায় নিয়ে ঐ মতলব! বেরো—

- সকলে চলিয়া গেলে রমা কহিল, ও সাধুপুরুষ, কেবল আমি কেঁদেছি—তুমি কাঁদো নি?···নাও, তোমার মেয়ে নাও, আমি একা একা বয়ে বেড়াতে পারি নে।

হেমলাল সভয়ে এক পা পিছাইয়া কহিল, যাই কর, মেয়ে মাথার উপর দিও না। সাত মেয়ে হবে তা বলে—

সজল স্নেহদীপ্ত চোখে খুকীর দিকে চাহিয়া রমা কহিল, দেখ, মুখ দেখে মায়া হয় না তোমার? ওকে তোমার ভালবাসতে হবে। খু-উ-উ-ব—

ছ'মাস ধরিয়া বিয়ের দিনই সাব্যস্ত হয় না। তারপর দিন ঠিক হইল তো গোল বাধিল জায়গা লইয়া। মোটে তখন দিন পনের বাকি, হঠাৎ নীলমাধবের চিঠি আসিল, কাজিডাঙ্গা অবধি যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না, তাঁহারা বড় জোর খুলনায় আসিয়া শুভকর্ম করিয়া যাইতে পারেন।

বিয়ের ঘটক শীতলচন্দ্র বিশ্বাস। চিঠি লইয়া সে-ই আসিয়াছিল। ভিড় সরিয়া গেলে আসল কারণটা সে শেষকালে ব্যক্ত করিল। প্রতিপক্ষ চৌধুরীদের সীমানা কাজিডাঙ্গার ক্রোশ তিনেকের মধ্যে। বলা তো যায় না, তিন ক্রোশ দূর হইতে কয়েক শত লাঠিও যদি আচমকা বিয়ের নিমন্ত্রণে চলিয়া আসে! তাহারা বরাসন হইতে বর তুলিয়া রাত্রির অন্ধকারে গাঙ পাড়ি দিয়া বসিলে অজ পাড়াগাঁয়ে জল-জঙ্গলের মধ্যে কেবল নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া করিবার কিছু থাকিবে না।

পাত্র জমিদারের ছেলে। জমিদারের ছেলে ঐ একটিমাত্র। অতএব এই ছ'মাস ধরিয়া যে জমিদার-বাড়ি শুভকর্মের গুরুতর আয়োজন চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আয়োজনের সত্য-কার চেহারাটা সহসা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে মেয়ের বাপের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

অথচ মিনুর মা আড় হইয়া পড়িলেন। ঐ তেইশে মেয়ের বিয়ে আমি দেবই—বার বার এইরকম গোছগাছ করে শেষ কালে যে··· না হয় তুমি সেই বি. এ. ফেল ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল।

কিন্তু অত বড় ঘর ও বরের লোভ ছাড়িয়া দেওয়া সোজা কথা

নয়। শেষ পর্যন্ত আবশ্যকও হইল না। সহরের প্রান্ত-সীমায় ভৈরব নদীর ধারে সেরেস্তাদার বাবু এক নূতন বাড়ি তুলিতেছিলেন। বাড়িটা তিনি কয়েক দিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন। সামনের ফাঁকা জমির ইট-কাঠ সরাইয়া সেখানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরযাত্রী বসিবার জায়গা হইল। পিছনে খাওয়ার জায়গা। যদি দৈবাৎ বৃষ্টি চাপিয়া পড়ে তাহা হইলে দোতলার দরদালানে সত্তর-আশি জন করিয়া বসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিকালে পাঁচ খানা গরুর গাড়ি বোঝাই আরও অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া পড়িল। লগ্ন সাড়ে আটটায়।

রাণী বলিল, মাসিমা, হিরণের বিয়ের বেলা আপনি বড্ড অন্যায় করেছিলেন। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি যে জামাই নিয়ে খাওয়াতে বসবেন—সে হবে না কিন্তু।

মিনুর মা হাসিলেন।

না, সে হবে না মাসিমা। সমস্ত রাত আমরা বাসর জাগব, কোন কথা শুনব না, বলে দিচ্ছি। নয় তো বলুন, এক্ষুণি ফের গাড়িতে উঠে বসি।

রসুই-ঘরের দিকে হঠাৎ গণ্ডগোল। বেড়ার উপরে কে জ্বলন্ত কাঠ ঠেস দিয়া রাখিয়াছিল, একটা অগ্নিকাণ্ড হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সকলের বিশ্বাস, কাজটা বামুন ঠাকুরের। তাই রাগ করিয়া কে তার গাঁজার কলিকা ভাঙিয়া দিয়াছে। পৈতা হাতে বারম্বার ব্রাহ্মণ-সন্তান দিব্যি করিতেছিল, বিনা অপরাধে তাহার গুরু দণ্ড হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে কলিকার দোষ নাই। তিন দিনের মধ্যে কলিকা মোটে সে হাতে লয় নাই।

বেলা ডুবিয়া যাইতে শীতল ঘটক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।

খবর কি? খবর কি?

শীতল কহিল, খবর ভাল। বর বরযাত্রীরা ওঁদের বাসাবাড়ি পৌঁছে গেছেন। জজবাবুর বড় মোটর এনে সাজানো হচ্ছে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে এসে পড়বেন।

তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল, একশ' বরকন্দাজ ঘাট আগলাচ্ছে। কি জানি কিছু বলা যায় না। আমাদের কর্তাবাবু একবিন্দু খুঁত রেখে কাজ করেন না।

মোটরের আওয়াজ উঠতেই ধুপধাপ করিয়া আট-দশটা মেয়ে ছুটিল তেতলার ছাতে। সকলের পিছন হইতে নিরু বলিল, যাওয়া ভাই অনর্থক। ছাত থেকে কিছু দেখা যাবে না। তার চেয়ে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে—

কৌতূহল চোখ-মুখ দিয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছে। ঠাট্টা-তামাসা—ছুটাছুটি—মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ। তার মধ্যে যুক্তি বিবেচনার কথা কে শুনিবে?

রাণী সকলের আগেভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আঙুল দিয়া দেখাইল, ঐ, ঐ বর—দেখ—

মরবি যে এক্ষুণি পড়ে—ছাতের এখনো আলসে হয় নি দেখছিস? বলিয়া আর একটি মেয়ে রাণীকে পিছে ঠেলিয়া নিজে আগে আসিল। যেন সে মোটেই পড়িয়া মরিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল, কই? ও রাণী বর দেখলি কোন্ দিকে?

গলায় ফুলের মালা—ঐ যে। দেখতে পাও না—তুমি যেন কি রকম সেজদি।

সেজদি বলিল, মালা না তোর মুণ্ডু। ও যে এক বুড়ো—সাদা চাদর কাঁধে। থুথুড়ে মাগো, তিন কালের বুড়ো—ও বরের ঠাকুরদাদা। বর এতক্ষণ কোন কালে আসনে গিয়ে বসেছে।

ছাতের উপর হইতে বরাসনে নজর চলে না, দেখা যায় কেবল সামিয়ানা।

নিরু বলিল, বলেছি তো অনর্থক। তার চেয়ে নিচে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে দেখিগে চল্।

চল্ চল্—

অন্ধকারে নদী মৃদুতম গানের সুর তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ওপারেও যেন কিসের উৎসব—অনেকগুলা আলো, ঢাকের বাজনা।··· সহসা এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস উহাদের রঙিন শাড়ি কেশ-বেশের সুগন্ধ উচ্ছল কলহাস্যের টুকরাগুলি উড়াইয়া ছড়াইয়া বহিয়া গেল।

ঘুমিয়ে কে রে? মিনু? ওমা—মাগো, যার বিয়ে তার মনে নেই। পালিয়ে এসে চিলেকোঠায় ঘুমোনো হচ্ছে!

রাণী হাত ধরিয়া নাড়া দিতে মিনু একবার চাহিয়া চোখ বুজিল।

নিরু বলিল, আহা সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমোক না একটু—আমরা নিচে যাই—

সেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, গিন্নিপনা রাখ্ দিখি। আমরাও না খেয়ে ছিলাম একদিন। ঘুমোনোর দফা শেষ আজকের দিন থেকে। কি বলিস রে রাণী?

বিশেষ করিয়া রাণীকেই জিজ্ঞাসা করিবার একটা অর্থ আছে। কথাটা গোপনীয়, কেবল সেজদি আড়ি দিতে গিয়া দৈবাৎ জানিয়া ফেলিয়াছিল। রাণী মুখ টিপিয়া হাসিল। তুই হাতে ঘুমন্ত মিনুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমু খাইতে লাগিল।

মিনু ভাই, জাগো—আজকে রাতে ঘুমোতে আছে? উঠে বর দেখসে এসে।

তারপর মিনুর এলোচুলে হাত পড়িতে শিহরিয়া উঠিল।

দেখেছ? সন্ধ্যেবেলায় আবার নেয়ে মরেছে হতভাগী। শুয়ে শুয়ে চুল শুকোনো হচ্ছে। ভিজে চুল নিয়ে এখন উপায়? এই রাশ বাঁধতে কি সময় লাগবে কম?

নিচে উলুধ্বনি উঠিল। পিসিমা নন্দরাণী শুভা ওদের সব গলা।

চল্ চল্—

চুল বাঁধতে ওঠ্ মিনু, শিগগির উঠে আয়—বলিয়া মিনুর এলোচুল ধরিয়া জোরে এক টান দিয়া রাণী ছুটিয়া দলে মিশিল। সিঁড়িতে আবার সমবেত পদধ্বনি।

ধড়মড় করিয়া মিনু উঠিয়া বসিল। তখন রাণীরা নামিয়া গিয়াছে, ছাতে কেহ নাই।

ঘুমচোখে প্রথমটা ভাবিল এটা যেন তাদের কাজিডাঙার বাড়ির দক্ষিণের চাতাল। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে। ছাতে ঝাপসা-ঝাপসা আলো। ওদিকে ভয়ানক গণ্ডগোল উঠিতেছে।···সব কথা মিনুর মনে পড়িল—আজ তার বিয়ে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সকলে ডাকাডাকি লাগাইয়াছে। হঠাৎ নিচের দিকে কোথায় দপ করিয়া সুতীব্র আলো জ্বলিয়া অনেকখানি রশ্মি আসিয়া পড়িল ছাতের উপর। তাড়াতাড়ি আগাইয়া সিঁড়ি ভাবিয়া যেই সে পা নামাইয়া দিয়াছে—

চারিদিকে তুমুল হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। আসর ভাঙিয়া সকলে ছুটিল। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান চলিতেছিল, পায়ের আঘাতে আঘাতে সেটা যে কোথায় চলিয়া গেল তার ঠিকানা রহিল না। একেবারে একতলার বারান্দায় পড়িয়া মিনু নিশ্চেতন।

জল, জল···মোটর আনো···ভিড় করবেন না মশাই, সরুন—ফাঁক করে দিন···আহা-হা কি কর, মোটরে তোল শিগগির···

গামছা কাঁধে কোন দিক হইতে কন্যার বাপ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।

জজ বাবুর সেই মোটরে চড়িয়া মিনু হাসপাতালে চলিল। বড় রাস্তায় রশি দুই পথ গিয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, আর যাইতে হইল না।

রসুনচৌকি থামিয়া গিয়াছে। দরজার পূর্বদিকে ছোট লাল চাদরের নিচে চারিটা কলাগাছ পুতিয়া বিয়ের জায়গা হইয়াছিল। সেইখানে শব নামাইয়া রাখা হইল।

কাঁচা হলুদের মত রং, তার উপর নূতন গহনা পরিয়া যেন রাজ-রাজেশ্বরী হইয়া শুইয়া আছে। কনে-চন্দন আঁকা শুভ্র কপাল ফাটিয়া চাপ চাপ জমা রক্ত লেপিয়া রহিয়াছে, নাক ও গালের পাশ বহিয়া রক্ত গড়াইয়াছে—মেঘের মতো খোলা চুলের রাশি এখানে সেখানে রক্তের ছোপে ডগমগে লাল।

ভিতরে-বাহিরে নিদারুণ স্তব্ধতা। বাড়িতে যেন একটা লোক নাই। শবের মাথার উপরে একটি খরজ্যোতি গ্যাস জ্বলিতেছে। বাড়ির মধ্য হইতে স্তব্ধতা চিরিয়া হঠাৎ একবার আর্তনাদ আসিল, ও মা, ও মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমাণিক রাজরাণী মা—

নীলমাধব সকলের দিকে চাহিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন, হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ যে?

বরশয্যার প্রকাণ্ড মেহগ্নি-পালিশ খাট ক'জনে টানিয়া নামাইয়া আনিল।

এতক্ষণ বেণুধরকে লক্ষ্য হয় নাই। এইবার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া শবের পায়ের কাছে খাটের বাজুতে ভর দিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। হাতের মুঠায় কাজললতা তেমনি ধরা আছে। কাচের মতো স্বচ্ছ অচঞ্চল আধ-নিমীলিত ত্ু'টি দৃষ্টি। মৃতার সেই স্তিমিত চোখ ত্ু'টির দিকে নিষ্পলক চাহিয়া বেণুধর দাঁড়াইয়া রহিল।

বাপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাগলের মতো আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, একবার ভাল করে চা দিকি। চোখ তুলে চা' ও খুকী—

নীলমাধব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু থামিলেন না, সজল চোখে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, ও বেয়াই, বিনি দোষে মাকে আমার কত গালমন্দ করেছি—কোন সম্বন্ধ এগুতে

চায় না, তার সমস্ত অপরাধ দিনরাত মা ঘাড় পেতে নিয়েছে, একবার মুখ তুলে একটা কথা বলে নি। ও খুকী, আর বকব না—চোখ তুলে চা একটিবার—

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নীলমাধব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দেখবে তোমরা? আটটা বেজে গেছে, রওনা হও।

সাড়ে-আটটায় লগ্ন ছিল। বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। যেন শুভলগ্নে তাহাদের শুভদৃষ্টি হইতেছে, লজ্জানত বালিকা চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না, বাপ তাই মেয়েকে সাহস দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া গেট হইয়াছিল, সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সকলে শবের উপর ঢালিয়া দিল। বেণুধর গলার মালা ছিঁড়িয়া সেই ফুলের গাদায় ছুড়িয়া দ্রুত বেগে ভিড়ের মধ্য দিয়া পলাইয়া গেল।

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তা অবধি আসিল। সর্বাঙ্গ দিয়া ঘামের ধারা বহিতেছে, পা টলিতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মোটরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মতো সে বলিয়া উঠিল, চালাও এক্ষুণি—

গাড়ি চলিতে লাগিলে হুঁশ হইল, তখনো আগাগোড়া তাহার বরের সাজ। একবোঝা কোট-কামিজ, তার উপর শৌখিন ফুলকাটা চাদর—বিয়ের উপলক্ষে পছন্দ করিয়া সমস্ত কেনা। একটা একটা করিয়া খুলিয়া পাশে সমস্ত স্তূপাকার করিতে লাগিল।

তবু কি অসহ্য গরম! বেণুর মনে হইল, সর্বদেহ ফুলিয়া ফাটিয়া এবার বুঝি ঘামের বদলে রক্ত বাহির হইবে। ক্রমাগত বলিতে লাগিল, চালাও—খুব জোরে চালাও গাড়ি—

সোফার জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ?

যেখানে খুশি। ফাঁকায়—গ্রামের দিকে—

তীব্র বেগে গাড়ি ছুটিল। চোখ বুজিয়া চেতনাহীনের মতো বেণুধর পড়িয়া রহিল।

সুমুখ-আঁধার রাত্রি, তার উপর মেঘ করিয়া আরও আঁধার জমিয়াছে। জনবিরল পথের উপর মিটমিটে কেরোসিনের আলো যেন প্রেতপুরীর পাহারাদার। একবার চোখ চাহিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বেণু শিহরিয়া উঠিল। এমন নিবিড় অন্ধকার সে জীবনে দেখে নাই। দু'ধারের বাড়িগুলির দরজা-জানালা বন্ধ, ছোট শহর ইহারই মধ্যে নিশুতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আম-কাঁঠালের বড় বাগিচা।...সহসা কোথায় কোন দিক দিয়া উচ্ছল হাসির শব্দ বাজিয়া উঠিল, অতি অস্পষ্ট কৌতুক-চঞ্চল অনেকগুলা কণ্ঠস্বর—

বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও গো !

আশপাশের সারি সারি ঘুমন্ত বাড়িগুলির ছাতের উপর, আম-বাগিচার এখানে ওখানে, ল্যাম্পপোস্টের আবছায়ায় নানা বয়সের কত মেয়ে কৌতূহলভরা চোখে ভিড় করিয়া বউ দেখিতে দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর গাড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া এক পলকে যেন তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

বধূ তাহার পাশে রহিয়াছে...সত্যই একটি বউ মানুষ ঘোমটার মধ্যে জড়সড় হইয়া মাথা নোয়াইয়া একেবারে গদির সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে, গায়ে ছোঁয়া লাগিলে যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তারপর খেয়াল হইল, সে তার পরিত্যক্ত জামা-চাদরের বোঝা—মানবী নয়। এই গাড়িতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া চলিয়াছিল। সে বসিয়া নাই, তার দেহের দু-এক ফোঁটা রক্ত গাড়ির গদিতে লাগিয়া থাকিতে পারে।

শহর ছাড়িয়া নদীর ধারে ধারে গাড়ি ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিল। হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে। চারিদিকের নিঃশব্দতাকে পিষিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া খোয়া-তোলা রাস্তার উপর চাকার পেষণে কর্কশ সকরুণ আর্তনাদ উঠিতেছে। একটি পল্লী-কিশোরীর এই দিনকার সকল সাধ-বাসনা বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাকার সামনে সে যেন বুক পাতিয়া দিয়াছে। বাহিরে ঘন তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি—জনশূন্য মাঠ—কোন দিকে আলোর কণিকা নাই। সৃষ্টির আদি-যুগের অন্ধকারলিপ্ত নীহারিকামণ্ডলীর মধ্য দিয়া বেণুধর যেন বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর পাশে পাশে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া মরিতেছে নিঃশব্দচারিণী মৃত্যুরূপা তার বধূ। লাল বেনারসিতে রূপের রাশি মুড়িয়া লজ্জায় ভাঙিয়া শতখান হইয়া এখানে এক কোণে তার বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু একটি মুহূর্তের ঘটনার পরে এখন তার পথ হইয়াছে সীমাহীন বিপুল শূন্যতা—রাত্রির অন্ধকার মথিত করিয়া বাতাসের বেগে ফরফর শব্দে তার পরনের কালো কাপড় উড়ে, পায়ের আঘাতে জোনাকি ছিট-কাইয়া যায়, গতির বেগে সামনে ঝুকিয়া-পড়া ঘন চুল-ভরা মাথাটি —মাথার চারি পাশ দিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া বৃষ্টি বহিয়া যায়, এলোচুল উড়ে—দিগন্তব্যাপী ডগমগে লাল চুল।

দুই হাতে মাথা টিপিয়া চোখ বুজিয়া বেণুধর পড়িয়া রহিল। গাড়ি চলিতে লাগিল। খানিক পরে পথের ধারে এক বটতলায় থামিয়া হাটুরে-চালার মধ্যে বাঁশের মাচায় অনেকক্ষণ মুখ গুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে মন কিছু শান্ত হইলে বাসাবাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

নীলমাধব প্রভৃতি অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বরযাত্রীরা অনেকে মেল-ট্রেন ধরিতে সোজা স্টেশনে গিয়াছে। কেবল কয়েকজন মাত্র—যাঁরা খুব নিকট আত্মীয়—বৈঠকখানার পাশের ঘরে বালিশ কাঁথা

পুঁটুলি বই যা হয় একটা কিছু মাথায় দিয়া যে যার মতো শুইয়া পড়িয়াছেন। অনেক রাত্রি। হেরিকেনের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে।

আলোর সামনে ঠিক মুখোমুখি নির্বাক নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে বসিয়া নীলমাধব ও শীতল ঘটক।

বেণুকে দেখিয়া নীলমাধব উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, কাউকে কিছু না বলে বেড়িয়ে পড়লে—মোটর নিয়ে গিয়েছ শুনে ভাবলাম, বাসাতেই এসেছ। এখানে এসে দেখি তা নয়। ভারি ব্যস্ত হয়েছিলাম। জজ বাবুর বাড়ি বিজয় গিয়ে বসে আছে এখনো।

বেণুধর বলিল, বড্ড মাথা ধরল, ফাঁকায় তাই খানিকটে ঘুরে এলাম।

বলে যাওয়া উচিত ছিল—বলিয়া নীলমাধব চুপ করিলেন। ছেলে নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, তোমার খাওয়া হয় নি। দক্ষিণের কোঠায় খাবার ঢাকা আছে, বিছানা করা আছে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়—রাত জাগবার দরকার নেই।

ঘরে গিয়া নীলমাধবের ভয়ে ভয়ে ঢাকা খুলিয়া খাবার খানিকটা সে নাড়াচাড়া করিল, মুখে তুলিতে পারিল না।

দালানের পিছনে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, একটা উগ্র মিষ্ট গন্ধের আমেজ। মিটমিটে আলোয় রহস্যাছন্ন আধ-অন্ধকারে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, ঘর ভরিয়া কে-একজন বসিয়া আছে, তাহাকে ধরিবার জো নাই—অথচ তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য বন্যার মতো ঘর ছাপাইয়া যাইতেছে, কোণের দিকে দলিল-পত্র ভরা সেকেলে বড় ছাপবাক্সর আবডালে নিবিড় কালো বড় বড় দুটি চোখে অভুক্ত খাবারের দিকে বেদনাহত ভাবে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে। আলো নিভাইতেই সেই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য অকস্মাৎ বেণুধরকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

বাহিরের বৈঠকখানায় কথাবার্তা আরম্ভ হইল। শীতল ঘটক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, পোড়াকপালি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল !

তারপর চুপ। অনেকক্ষণ আর কথা নাই।

শীতল আবার বলিতে লাগিল, বুদ্ধিশ্রী ছিল মেয়েটার। মনে আছে কর্তাবাবু, সেই পাকা দেখতে গিয়ে আপনি বললেন, আমার মা নেই, একজন মা খুঁজতে এসেছি। আপনার কথা শুনে মেয়েটি কেমন ঘাড় নিচু করে রইল।

নীলমাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাম শীতল।

একেবারেই কথা বন্ধ হইল, দু'জনে চুপচাপ। আলো জ্বলিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে বেণুধরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। জীবনকালের মধ্যে কোন দিন যাহাকে দেখে নাই, মৃত্যুপথবর্তিনী সেই কিশোরী মেয়ের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি হঠাৎ যেন মাঠ বাড়ি বাগিচা ও এত রাস্তা পার হইয়া জানালা গলিয়া অন্ধকার ঘরখানির মধ্যে তাহার পদতলে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল।

তারপর কখন বেণু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জানালা খোলা, শেষ রাতে পূর্বদিগন্তে চাঁদ উঠিয়া ঘর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে, দিগন্তবিসারী ভৈরব শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কি একটা ভারি ভুল হইয়া যাইতেছে···হঠাৎ বড় ঘুম আসিয়া পড়িয়াছিল, কে আসিয়া কতবার তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া বেড়াইতেছে। ঘুমের আলস্য তখনও বেণুধরের সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে। তাহার তন্দ্রাবিবশ মনের কল্পনা ভাসিয়া চলিল—

ঠক—ঠক—ঠক—

খিল-আঁটা কাঠের কবাটের ওপাশে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি এখনো যে ক্ষীণ আঘাত করিতেছে, বেণুধর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

হাতের চুড়িগুলি গোছার দিকে টানিয়া আনা, চুড়ি বাজিতেছে না। শেষ প্রহর অবধি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শ্রান্ত দেহ আর বশ মানে না। চোখের কোণে কান্না জমিয়াছে। একটু আদরের কথা কহিলে, একবার নাম ধরিয়া ডাকিলে এখনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। ফিস-ফিস করিয়া বধূ বলিতেছে, দুয়োর খুলে দাও গো, পায়ে পড়ি—

উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনা দরকার। কিন্তু মনে যতই তাড়া, দেহ আর উঠিয়া গিয়া কিছুতেই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজী নয়। বেণুধর দেখিতে লাগিল, বাতাস লাগিয়া গাছের উপরের লতা যেমন পড়িয়া যায়, ঝুপ করিয়া তেমনি দোর-গোড়ায় বধূ পড়িয়া গেল। সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া পা অবধি তাহার নিবিড় তিমিরাবৃত চুলের রাশি এলাইয়া পড়িয়াছে।···বেণুধর দেখিতে লাগিল।

ক্রমে ফরসা হইয়া আসে। আম-বাগানের ডালে ডালে সদ্য-ঘুমভাঙা পাখির কলরব। ও-ঘর হইতে কে কাসিয়া কাসিয়া উঠিতেছে···। দিনের আলোর সঙ্গে মানুষের গতিবিধি স্পষ্ট ও প্রখর হইতে লাগিল। বেণুধর উঠিয়া পড়িল।

সকালের দিকে সুবিধা মতো একটা ট্রেন আছে। অথচ নীলমাধব নিশ্চিন্তে পরম গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানিতেছিলেন।

বেণু গিয়া কহিল, সাতটা বাজে—

বিনাবাক্যে নীলমাধব দু'টো টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, চা-টা তোমরা দোকান থেকে খেয়ে নাও।

বাড়ি যাওয়া হবে না ?

না—

বলিয়া তিনি গড়গড়ার নল রাখিয়া কি কাজে বাহিরে যাইবার উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণুধর ব্যাকুল কণ্ঠে পিছন হইতে প্রশ্ন করিল, কবে যাওয়া হবে ? এখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদের ?

মুখ ফিরাইয়া নীলমাধব ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন।

সে মুখে কি দেখিলেন, তিনিই জানেন—ক্ষণকাল মুখ দিয়া তাঁহার কথা সরিল না। শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, শীতল ঘটক ফিরে না এলে সে তো বলা যাচ্ছে না।

অনতিপরেই বৃত্তান্ত জানিতে বাকি রহিল না। শীতল ঘটক গিয়াছে তাহিরপুরে। গ্রামটা নদীর আড়পারে ক্রোশখানেকের মধ্যেই। ওখানে কিছুদিন একটা কথাবার্তা চলিয়াছিল। খুব বনিয়াদি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে। কিন্তু ইদানীং কৌলীন্যটুকু ছাড়া সে পক্ষের অন্য বিশেষ কিছু সম্বল নাই। অতএব নীলমাধব নিজেই পিছাইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কে আড়ালে ডাকিয়া সকল আক্রোশ বেণু তাহারই উপর মিটাইল। কহিল, কশাই তোমরা সব।

অথচ সে একেবারেই নিরপরাধ। কিন্তু সে তর্ক না করিয়া বিজয় সান্ত্বনা দিয়া কহিল, ভয় নেই ভাই, ও কিচ্ছু হবে না দেখো। ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, সে কি হয় কখনো? কাকার যেমন কাণ্ড!

কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল, ঘটক হাসিমুখে হন-হন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সামনে পাইয়া সুসংবাদটা তাহাদেরই সর্বাগ্রে দিল।

পাকাপাকি করে এলাম ছোটবাবু—

তবু বিজয় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, পাকাপাকি করে এলে কি রকম? এই ঘণ্টা দুই-তিন আগে বেরুলে—আগে কোন খবরাখবর দেওয়া ছিল না। এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেল?

শীতল সগর্বে নিজের অস্থিসার বুকের উপর একটা থাবা মারিয়া কহিল, এর নাম শীতল ঘটক, বুঝলেন বিজয় বাবু, চল্লিশ বছরের

পেশা আমার। কিছুতে রাজী হয় না—হেনো-তেনো কত কি আপত্তি। ফুস-মন্ত্রে সমস্ত জল করে দিয়ে এলাম।

বলিয়া শূন্যে মুখ তুলিয়া ফুৎকার দিয়া মন্ত্রটার স্বরূপ বুঝাইয়া দিল।

বেণুধর কহিল, আমি বিয়ে করব না।

শীতল অবাক হইয়া গেল। সে কেবল অপর দিকের কথাটাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। একবার ভাবিল, বেণুধর পরিহাস করিতেছে।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সন্দিগ্ধ সুরে বলিতে লাগিল, তাই কখনো হয় ছোটবাবু? লক্ষ্মী-ঠাকরুনের মতো মেয়ে। ছবি নিয়ে এসেছি, মিলিয়ে দেখুন। কালকের ও-মেয়ে এর দাসী-বাঁদীর যুগ্যি ছিল না।

বেণুধর কঠোর সুরে বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি যা বলবার বলে দিইছি শীতল। তুমি বাবাকে আমার কথা বোলো।

বলিয়া আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ক্ষণপরে তাহার ডাক পড়িল।

নীলমাধব বলিলেন, শুনলাম, বিয়েয় তুমি অনিচ্ছুক?

বেণু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলমাধব বলিতে লাগিলেন, তা হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে বল?

কোন প্রকারে মরীয়া হইয়া বেণুধর বলিয়া উঠিল, কালকের সর্বনেশে কাণ্ডে আমার মন কি রকম হয়ে গেছে বাবা, আমি পাগল হয়ে যাব। আর কিছু দিন সময় দিন আমায়—

বলিতে বলিতে স্বর কাঁপিতে লাগিল। এক মুহূর্ত সামলাইয়া লইয়া বলিল, মরা মানুষ আমার পিছু নিয়েছে।

ভ্রূ বাঁকাইয়া নীলমাধব ছেলের দিকে চাহিলেন। একটুখানি নরম হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এদিকের সর্বনাশটা ভাব একবার। বাড়িশুদ্ধ কুটুম্ব গিস-গিস করছে, সতের গ্রাম নেমন্তন্ন। বউ দেখবে বলে সবাই হাঁ করে বসে আছে। যেমন তেমন ব্যাপার নয়, এত বড় জেদাজেদির বিয়ে। আর চৌধুরিদের মেজকর্তা আসবেন—

অপমানের ছবিগুলি চকিতে নীলমাধবের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। চৌধুরিদের মেজকর্তা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, তিলার্ধ দেরি না করিয়া জপের মালা হাতে লইয়াই খড়ম খট-খট করিতে করিতে সমবেদনা জানাইতে আসিবেন—আসিয়া নিতান্ত নিরীহ মুখে উচ্চ কণ্ঠে একহাট লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অতি গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন, বলি ও নীলমাধব, আসল কথাটা বল্ দিকি, বিয়ে এবারও ভাঙল—মেয়ে কি তারা অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে ?···

ভাবিতে ভাবিতে নীলমাধব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, না বেণুধর, বউ না নিয়ে বাড়ি ফেরা হবে না। পরশুর আগে দিন নেই। তুমি সময় চাচ্ছিলে—বেশ তো, মাঝের এই দুটো দিন থাকল। এর মধ্যে নিশ্চয় মন ভাল হয়ে যাবে।···

বারোয়ারির মাঠে যাত্রা আসিয়াছে। বিকাল হইতে গাওনা শুরু। বেণুধর সমবয়সি জন দুই-তিনকে পাকড়াইয়া বলিল, চল যাই।

বিজয় বলিল, আমার যাওয়া হবে না তো। বিস্তর জিনিসপত্তর বাঁধাছাঁদা করতে হবে। রাত্রে ফিরে যাচ্ছি।

কেন ?

গ্রামে গিয়ে খবর দিতে হবে বউভাতের তারিখ দুটো দিন পিছিয়ে গেল। কাকা বললেন, তুমিই চলে যাও বিজয়।

গাড়ি সেই কোন রাতে—আমরা থাকব বড় জোর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা। চল চল—

বেণুধর ছাড়িল না, ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের মধ্যে বিজয়কে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে পরশু দিন ঠিক হল?

হ্যাঁ—

পরশু রাত্রে?

তা ছাড়া কি—

চুপ করিয়া খানিক কি ভাবিয়া বেণুধর করুণ ভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল, রাত্রি আসছে, আর আমার ভয় হচ্ছে। তুমি বিশ্বাস করবে না বিজয়, ঐ অপঘাতে-মরা মেয়েটা কাল সমস্ত রাত আমায় জ্বালাতন করেছে।

আবার একটু স্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, মরা ব্যাপারটা আর আমি বিশ্বাস করছি নে। এত সাধ-আহ্লাদ-ভালবাসা পলক ফেলতে না ফেলতে উড়িয়ে পুড়িয়ে চলে যাবে—সে কি হতে পারে? মিছে কথা। এ আমার অনুমানের কথা নয় বিজয়, কাল থেকে স্পষ্ট করে জেনেছি।

বিজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল, তুমি এসব কথা আর বোলো না ভাই, আমাদেরও শুনলে ভয় করে।

ভয় করে? তবে বলব না।

বলিয়া বেণু টিপি-টিপি হাসিতে লাগিল। বলিল,—কিন্তু যাই বল, এই শহরে পড়ে থাকা আমাদের উচিত হয় নি—দূরে পালানো উচিত ছিল। এই আধক্রোশের মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটল তো!

যাত্রা দেখিয়া বেণু অতিরিক্ত রকম খুশী হইল। ফিরিবার পথে কথায় কথায় এমন হাসি-রহস্য—যেন সে মাটি দিয়া পথ চলিতেছে না।

তখন সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। পথের উপর অজস্র কামিনীফুল ফুটিয়াছে। ডালপালাসুদ্ধ তাহার অনেকগুলি ভাঙিয়া লইল।

বলিল, খাসা গন্ধ! বিছানায় ছড়িয়ে দেব।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, ফুলশয্যার দেরি আছে তো—

কোথায়? বলিয়া বেণু প্রচুর হাসিতে লাগিল। বলিল, এ-পক্ষের দিন রয়েছে তো কাল। আর তাহিরপুরেরটার—ও বিজয়, তোমাদের নতুন সম্বন্ধের ফুলশয্যার দিন করেছে কবে?

বিজয় রীতিমতো রাগিয়া উঠিল, ফের ঐ কথা? এ-পক্ষ ও-পক্ষ —বিয়ে তোমার ক'টা হয়েছে শুনি?

আপাতত একটা। কাল যেটা হয়ে গেল—। আর একটার আশায় আছি।

বিজয়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বেণু বলিতে লাগিল, ও বিজয়, ভয় পেলে নাকি? ভয় নেই, আজ সে আসবে না। আজকে কালরাত্রি—বউয়ের দেখা করবার নিয়ম নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ প্রফুল্ল ভাবে বেণুধর শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসে না। আলো নিভাইয়া দিল। কিছুতে ঘুম আসে না। পাশে কোন বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে। চারিদিক নিশুতি। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমের সাধনা করিয়া কাহার উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। রাগ করিয়া গায়ের কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া জোরে জোরে বাহিরে পায়চারি করিতে লাগিল। খণ্ড-চাঁদ ক্রমশ আম-বাগানের মাথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।···আবার সে ঘরে ঢুকিল। বিছানার পাশে গিয়া মনে হইল, ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া লঘুপায়ে কে কোথায় পলাইয়া গেল। বাতাসে বাগিচার গাছপালা খস-খস করিতেছে। বেণুধর ভাবিতে লাগিল, নূতন কোরা-কাপড় পরিয়া খস-খস করিতে করিতে এক অদৃশ্যচারিণী বনপথে বাতাসে বাতাসে দ্রুতবেগে মিলাইয়া গেল।

পরদিন তাহিরপুরের পাত্রীপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। হাসিমুখেই আশীর্বাদের আংটি সে হাত পাতিয়া লইল। মনে মনে বাপের বহুদর্শিতার কথা ভাবিল। নীলমাধব সত্যই বলিয়াছিলেন, এই দু'টা দিন সময়ের মধ্যেই মন তাহার আশ্চর্য রকম ভাল হইয়া উঠিয়াছে। চুরি করিয়া এক ফাঁকে বাপের ঘর হইতে পাত্রীর ছবিটা লইয়া আসিল। মেয়ে সুন্দরী বটে! প্রতিমার মতো নিখুঁত নিটোল গড়ন।

সেদিন একখানা বই পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শিয়রে তেপায়ার উপর ভাবী বধূর ছবিখানি। ম্লান দীপালোকিত চুণকাম-খসা উঁচু দেয়াল, গম্বুজের মতো খিলান-করা সেকেলে ছাত,—তাহারই মধ্যে মিলনোৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের সহগামী হইয়া রাত্রি অবধি সে বই পড়িতে লাগিল।

একবার কি রকমে মুখ ফিরাইয়া বেণুধর স্তম্ভিত হইয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ—তাহার মধ্যে এক বিন্দু সন্দেহ করিবার কিছু নাই—জানালার শিকের মধ্য দিয়া হাত গলাইয়া চাঁপার কলির মতো পাঁচটি আঙুল লীলায়িত ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভাল করিয়া তাকাইতেই বাহিরের নিকষকালো অন্ধকারে হাত ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জানালায় আসিল। আর কিছুই নাই, নৈশ বাতাসে লতাপাতা দুলিতেছে। সজোরে সে জানালার খিল আঁটিয়া দিল।

আলোর জোর বাড়াইয়া দিয়া বেণুধর পাশ ফিরিয়া শুইল। চটা-ওঠা দেয়ালের উপর কালের দেবতা কত কি নক্সা আঁকিয়া গিয়াছে! উল্টা-করা তালের গাছ···একটা মুখের আধখানা···ঝুঁটিওয়ালা অদ্ভুত আকারের জানোয়ার আর একটা কিসের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া আছে—ঝুল কালি ও মাকড়শা-জালের বন্দীশালায় কালো কালো শিকে আড়ালে কত লোক যেন আটক হইয়া রহিয়াছে···

চোখ বুজিয়া সে দেখিতে লাগিল—

অনেক দূরে মাঠের ওপারে কালো কাপড় মুড়ি-দেওয়া সারি সারি মানুষ চলিয়াছে—পিঁপড়ার সারির মতো মানুষের অনন্ত শ্রেণী। লোকালয়ের সীমানায় আসিয়া কে-একজন হাত উঁচু করিয়া কি বলিল। মুহূর্তকাল সব স্থির। আবার কি সঙ্কেত হইল। অমনি দল ভাঙিয়া নানাজনে নানাদিকে পথ-বিপথ ঝোপ-জঙ্গল আনাচ-কানাচ না মানিয়া ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।···

এই রাত্রে আঙিনার ধূলায় কোথায় এক পরম দুঃখিনী এলাইয়া পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া দাপাদাপি করিতেছে—

ওমা—মাগো আমার—ও আমার লক্ষীমাণিক রাজরাণী মা!

অন্ধকারের আবছায়ে ছোট ঘুলঘুলির পাশে তন্বী কিশোরীটি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে। শিয়রে নূতন বধূ চুপটি করিয়া বাসর জাগে। বর বুঝি ঘুমাইল।···

বেণুধর উঠিয়া বসিয়া পরম স্নেহে স্মিতমুখে শিয়রে তেপায়ার উপরের ছবিখানির দিকে তাকাইল। কাল সারা রাত্রি তাহারা জাগিয়া কাটাইবে।

রুদ্ধ জানালায় সহসা মৃদু মৃদু করাঘাত শুনিয়া বেণুধর চমকিয়া উঠিল। শুনিতে পাইল ভয়ার্ত চাপা-গলায় ডাকিয়া কে যেন কি বলিতেছে। একটি অসহায় প্রীতিমতী বালিকা বাপ-মা এবং চেনা-জানা সকল আত্মীয়-পরিজন ছাড়িয়া আসিয়া ঐ জানালার বাহিরে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ বেণুধর তিলার্ধ দেরি করিল না। দুয়ার খুলিয়া দেখে, ইতিমধ্যে বাতাস বাড়িয়া ঝড়

বহিতে শুরু হইয়াছে। সন-সন করিয়া ঝড় দালানের গায়ে পাক খাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

এসো—

উঁহু।

এসো—

না।

বাতাসে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

বেণুধর নির্ণিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য পলায়নপরার পিছনে ছুটিল। ঝোড়ো হাওয়ায় কথা না ফুটিতে কথা উড়াইয়া লইয়া যায়। তবু সে যুক্তকরে বারম্বার এক অভিমানিনীর উদ্দেশে কহিতে লাগিল, মিছে কথা, আমি বিয়ে করব না, আমি যাব না কাল। তুমি এসো—ফিরে এসো—

নিশীথ রাত্রি।

মেঘ-ভরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ভৈরবের বুকেও যেন প্রলয়ের জোয়ার লাগিয়াছে। ডাক ছাড়িয়া কূল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। বেণুধর নদীর কূলে কূলে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু ও জীবনের সীমারেখা এই পরম মুহূর্তে প্রলয়-তরঙ্গে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এই ক্ষণ প্রতিদিন আসিয়া থাকে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—পলে পলে রাত্রির বক্ষস্পন্দন বাড়ে—তারপর অনেক, অনেক—অনেক ক্ষণ পরে মধ্য-আকাশ হইতে একটি নক্ষত্র বিদ্যুগতিতে খসিয়া পড়ে, ঝন-ঝন করিয়া মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, পৃথিবীর মানুষের শিয়রে ওপারের লোক দলে দলে আসিয়া বসে, ভালবাসে, আদর করে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া কত কথা কহিয়া যায়—

আজ স্বপ্নলোকের মধ্যে নয়, জাগ্রত দুই চক্ষু দিয়া মৃত্যুলোক-বাসিনীকে সে দেখিতে পাইয়াছে। দু'টি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। দিগন্তব্যাপ্ত মেঘবরণ চুলের উপর ডগমগে লাল কয়েকটি রক্তবিন্দু প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে আলেয়ার মতো বেণুধরকে দূর হইতে দূরে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।

যুদ্ধের খোকা

—আশালতার মনে হইল, মা-মা-মা—করিয়া টানিয়া টানিয়া বড় আকুল স্বরে পাশ হইতে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। তার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

স্বামী একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন। নাড়িয়া ঠেলিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল, ওগো, সরো—একেবারে চেপে পড়েছ ওকে, সরে যাও একটু।

ঘুমের ঘোরে শ্রীশ জিজ্ঞাসা করিল, কি হল ?

খোকা কাঁদছে, তুমি ব্যথা দিয়েছ। শুনতে পাচ্ছ না ওর কান্না ? ও তো আমার কাঁদবার ধন নয়—

ঘর অন্ধকার। বৈশাখ মাসে অকাল-বর্ষা শুরু হইয়াছে। জানলার ও-পাশে রেল-লাইনের ধারে ধারে কসাড় জঙ্গলে ঠাণ্ডা জোলো বাতাস সরসর খসখস শব্দ করিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে আচমকা তাহার এক এক ঝাপটা ঘরে আসিয়া ঢোকে, কবাট নাড়িয়া মশারি উড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

গলার স্বরে মনে হইল, আশার চোখ দিয়া বুঝি জল পড়িতেছে।

শ্রীশ খুব কাছে আসিয়া সস্নেহে তার মাথাটি বুকের উপর তুলিয়া লইল। বলিতে লাগিল, ও আশা, স্বপ্ন দেখলে নাকি ? চুপ করে ঘুমোও, ভয় কি !

তারপর ঘণ্টাখানেক হইবে কি না হইবে, শ্রীশ আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—এবারে আশা ধড়মড় করিয়া একদম বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে শুনিতে লাগিল, খুব শ্লেষ্মা হইয়া অসুখ করিলে

গলা দিয়া যেমন ঘড়ঘড় আওয়াজ হয় ঘরের মেজে কি আর কোনখান দিয়া তেমনি ধরনের যেন একটা অস্পষ্ট চাপা কাতরানি —আর কাটা-কবুতরের মতো কি যেন এদিক-সেদিক পাখা ঝাপটাইয়া বেড়াইতেছে। আশা বসিয়া রহিল, কোন সাড়াশব্দ দিল না। ক্রমশ শুনিতে লাগিল, সেই একটানা গলার আওয়াজ একটু পরিস্ফুট হইয়া তাহাকেই ডাকিয়া ডাকিয়া বেড়াইতেছে।

খোকার গলা—সেইরকম মিষ্টি জড়ানো-জড়ানো, অবিকল!

উজ্জ্বল মুখে সেই অন্ধকারের মধ্যে সে খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। যেন রেল-লাইন ছাড়াইয়া কত কত দেশ-দেশান্তর নদী-সমুদ্রের পরপার হইতে স্তিমিত-তারা রাত্রির স্তব্ধতা চিরিয়া ফুঁড়িয়া শব্দ আসিতেছে। আবার সন্দেহ হয়, এ ডাক ঘরের মধ্যেরই—অনেক নিচের পাতালপুরী হইতে সমস্ত মাটি ইঁট ও সিমেণ্ট ভেদ করিয়া অতিশয় করুণ ক্ষীনকণ্ঠে খোকা তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিতেছে, মা, মা, মা, মা—

পা ছড়াইয়া দিয়া বহুকালের অসংস্কৃত সুরকি-ওঠা মেজের উপর পাষাণপ্রতিমার মতো সে বসিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে দু-চোখ ছাপাইয়া নিঃশব্দে জল পড়িতে লাগিল। জানলা দিয়া বাহিরে কেবলমাত্র সিগন্যাল-পোস্টের রক্তচক্ষুটি দেখা যায়। আশা ভাবিতে লাগিল, কোন দেশে এই রাত্রে ঘুমভাঙ্গা একটি অসহায় ছেলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা চিরিয়া ফেলিতেছে, ওখানে ছেলে শান্ত করিবার কি কেউ নাই?···

আরও অনেক রাত্রে মেঘ কাটিয়া চাঁদ উঠিল, ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। হঠাৎ একসময়ে জাগিয়া উঠিয়া শ্রীশ দেখিল, আশা বিছানায় নাই, নিচে সিমেণ্টের মেজের উপর এলোচুলের বোঝা এলাইয়া ঝড়-ঝাপটায় আহত পাখিটির মতো পড়িয়া রহিয়াছে।

কাছে আসিয়া দেখিল, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—অঘোরে ঘুমাইতেছে। সে ছবি দেখিয়া শ্রীশের মন কেমন করিয়া উঠিল, সোনার পদ্মের কি দশা হইয়া যাইতেছে দিন দিন!

ভোরে জাগিয়া প্রথমটা আশা এ রকম ভাবে নিচে পড়িয়া থাকিবার মানে বুঝিতে পারিল না। শেষে মনে পড়িতে লাগিল। ভাগ্যিস উনি এখনো জাগেন নাই! জাগিয়া এই দশা যদি দেখিতে পাইতেন, লজ্জার কি আর কিছু বাকি থাকিত? তাড়াতাড়ি চুল ও কাপড়চোপড় ঠিক করিয়া ভালমানুষ হইয়া বিছানার উপর যাইবে, এমন সময় ঠাহর হইল—সর্বনাশ, মেজেয় পড়িয়া থাকিবার সময়েও যে তার পাশে ছিল পাশবালিশ, মাথার নিচে ছোট তাকিয়াটা। কাঁদিতে কাঁদিতে যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, বালিশ নিশ্চয় সে নিজে খাটের উপর হইতে নামাইয়া আনে নাই। মাথার নিচে বালিশ কে গুঁজিয়া দিল তবে? শিয়রের দিকে আবার এক-খানা হাত-পাখাও পড়িয়া রহিয়াছে।

ঘরের মধ্যে তখনও স্পষ্ট আলো হয় নাই, আবছা আলো শ্রীশের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। করুণ অসহায় মুখ—ঘুমন্ত অবস্থায়ও যেন মনের দুশ্চিন্তা কাটে নাই। আশা সঙ্কল্প করিল, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যেমন করিয়া হোক সে ভাল হইয়া উঠিবে, খোকার কথা একবিন্দু ভাবিবে না আর, ওঁকে আর ভাবাইয়া মারিবে না।

ন'টা-পঁচিশের লোকাল ট্রেন বিদায় হইলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আর গাড়ি নাই। সেই ফাঁকে শ্রীশ বাজারে গিয়া নূতন একজন এলোপ্যাথি ডাক্তার লইয়া আসিল। আশাকে খবর দিতে সে হাসিয়া খুন।

তুমি পাগল হলে নাকি? ঠিক পাগল হয়েছ। নিশ্চয়—

হয়েছি হয়েছি, বেশ! বলিতে বলিতে বারকতক সন্দিগ্ধ

দৃষ্টিতে আশার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ শ্রীশ খপ করিয়া তার ডান হাত টানিয়া বাহির করিল।

কি সর্বনাশ বল দিকি—আবার রান্নাঘরে হলুদ বাটতে বসে গেছলে?

একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গিয়া আশা আর জবাব দিতে পারিল না।

চেঁচাইয়া বাড়ি মাত করিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া শ্রীশ বলিতে লাগিল, কাপড়ের নিচে হাত ঢাকা হচ্ছে, তখনই বুঝেছি। এত করে মানা করি, রান্নাঘরে আগুনের কাছে যেও না—পয়সা দিয়ে রাঁধুনি রাখলাম কি জন্যে? আজ আমি কুরুক্ষেত্র করে ছাড়ব। ভাল-মানুষ পেয়ে কথা গ্রাহ্য হয় না, না?

আশা বলিল, ইস, ভালমানুষ না আরো কিছু! আমায় ছুঁয়ে দিলে তো স্টেশনের ঐ সাতবাসি কাপড়ে—কেন আমায় ছুঁয়ে দিলে বল তো? কিছু আর বাছবিচার রইল না তোমার জ্বালায়—ম্লেচ্ছ কোথাকার!

হুড়মুড় করিয়া কুলুঙ্গি হইতে মশলা-ভরা বিস্কুটের টিন পাঁচ সাতটা পড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে আলনার কাপড়-জামা একরাশ এবং আচারের জারটিও মাটিতে পড়িয়া শত কুচি হইয়া গিয়াছিল আর কি—

আশা তাড়াতাড়ি আসিয়া সেটা ধরিয়া ফেলিল।

এবারে সত্যসত্যই বিরক্ত হইয়া বলিল, ও কি হচ্ছে আমার মাথামুণ্ডু? কি চাই, বললেই তো হয়। সব হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করে দিলে—আমার একবেলা লাগবে গোছাতে। কি খুঁজছ?

অপ্রতিভ হইয়া শ্রীশ কহিল, সাবান খুঁজছিলাম। তুমি শিগগির হলুদমাখা হাত ধুয়ে সাফ হয়ে এস। ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে।

আশা ধীরে সুস্থে একটা একটা করিয়া জিনিসপত্র তুলিয়া গোছাইতে লাগিল, জবাব দিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া আবার শ্রীশ কহিল, যাও—দেরি কোরো না। শিগগির এস, এক মিনিটের মধ্যে—

ইঃ হুকুম চালাচ্ছেন, ভারি ইয়ে হয়েছেন। আসব না আমি শিগগির, এই গিয়ে কুয়োতলায় বসলাম, আসব সে-ই বিকেলবেলায়—

বলিয়া কয়েক পা গিয়া আবার আশা ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমায় বলা হল না, কওয়া হল না, ডাক্তার আনা হয়েছে—দেখো, কি বেকুব করি আজ তোমাকে। টাকা-পয়সা আমার বাক্সে তো, ভিজিট এক পয়সাও বের করব না। দেখি—

সেইখানে দাঁড়াইয়া টিপিটিপি হাসিতে লাগিল। অপর পক্ষের যত ব্যস্ততা দেখে, ততই হাসিতে থাকে।

শ্রীশ কাছে আসিয়া অনুনয়ের ভঙ্গিতে কহিল, না, না—দেরি কোরো না আর। যাও, যাও—

যাচ্ছি গো—

বলিয়া আশা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। স্বামীর দুই কাঁধে বাহু দু'টি রাখিয়া স্নিগ্ধ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, এই যে সব ডাক্তার-কবরেজ হেনোতেনো—আমার কি হয়েছে যে তুমি এত করছ?

আয়না ধরে দেখ আগে কি হয়েছে—তারপর বোলো।

ছাই হয়েছে—বলিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া আশা স্বামীর বিশুষ্কমুখে আনন্দ আনিবার প্রয়াস করিল। সোনার চুড়ি ঝিনমিন করিয়া বাজাইয়া একখানা হাত তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখছ, কত মোটা হয়েছি আমি, দেখ একবার। তুমি কেবল মিছেমিছি ভাববে, তা কি হবে?

শ্রীশ বলিল, মিছেমিছি বই কি!

এমন ভীতু মানুষ, তোমায় নিয়ে কি যে করি!

সহসা রাত্রির ঘটনা মনে পড়িয়া আশা আর হাসিতে পারিল না।...

নিশিরাত্রে কোনদিকে কেউ যখন জাগিয়া থাকে না, মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, আপনার জনকে দেখিবার জন্য সেই সময়ে দলে দলে ওপারের লোক পৃথিবীর পথে বেড়াইতে আসে।

কাল রাতে তার মা-হারা খোকা ঐ জানলার ধারে কি কোনখানে আসিয়া তাহাকে মা-মা বলিয়া ডাকিয়াছিল।

যে-খোকাকে চার বছরের মধ্যে একটা দিন সে কোল-ছাড়া করিতে পারিত না, সে আবার কোলে আসিতে চাহিয়াছিল – দিনের আলোয় এই কথা ভাবিতে গিয়া ভয়ে আশার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণকাল অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর সহজ গলায় বলিল, দেখ—রোগ আর কিছু নয়—বড্ড খারাপ স্বপ্ন দেখি। তোমার ডাক্তারে তার কি করবে?

ডাক্তারি ওষুধ আছে।

ছাই আছে, তা হলে কি খোকন আমার—

আশার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, আর শব্দ বাহির হইল না। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আঁচল টানিয়া দ্রুতবেগে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন শুইবার আগে আশা নূতন ডাক্তারের দেওয়া উৎকট বিস্বাদ ঔষধ পর পর দুই দাগ খাইল। অত রাতে চুলের বোঝা ভিজিয়া গেল, বালিশ-বিছানাও ভিজিয়া যাইবে—তবু অঞ্জলি ভরিয়া ভাবিয়া মাথায় জল দিল। গোবিন্দ, গোবিন্দ—বলিতে বলিতে শুইয়া পড়িল। ঐ নামে নাকি দুঃস্বপ্ন বিছানার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিতে পারে না। শুইয়া শুইয়া মনে করিতে লাগিল, কালো বকনা গরু··· কাঁটাঝিটকের জঙ্গল···জবাফুল···জলের কলসি···। আর কিছুতে কোনক্রমে খোকার কথা মনে ঢুকিতে দিবে না।

তখন অনেক রাত্রি। জ্যোৎস্না উঠিবার কথা, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে আকাশ মেঘে আঁধার হইয়া চারিদিক গুমট করিয়াছে। হঠাৎ ঘুম

ভাঙিয়া আশার মনে হইল, বরফের মতো শীতল কচি কচি পাঁচটা আঙুল কে যেন তার মুখের উপর দিয়া চোখ-কান-গালের উপর বুলাইয়া গেল। একবার চোখ মেলিয়া আবার তখনই চোখ বুজিয়া সতর্ক হইয়া রহিল, এইবার যেই মুখের উপর হাত লইয়া আসিবে, অমনি ধরিয়া ফেলিয়া চেঁচাইয়া উঠিবে।...কিন্তু সে বুঝি টের পাইয়াছে, আর আসিল না।

একটু পরে শুনিতে লাগিল, মেজের উপর তালে তালে খুট-খুট শব্দ হইতেছে, নূতন জুতা পরিয়া অনভ্যস্ত পায়ে আনন্দে চলিয়া বেড়াইবার মতো ভাবটা। আর আশা বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিল না, উত্তেজনার বশে উঠিয়া বসিল। মুখ-চোখ আনন্দে চকচক করিতে লাগিল, হাসিমুখে শব্দের তালে তালে হাততালি দিয়া বলিতে লাগিল—

হাঁটি হাঁটি পা—পা
খোকন হাঁটে দেখে যা—

অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে লাগিল, সাদা সাদা দুধে-দাঁত মেলিয়া খোকন হাসিতেছে। চার বছরের খোকা তাহার মৃত্যুপারের দেশ হইতে আবার এক বছরেরটি হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এক বছর বয়সে নূতন হাঁটিতে শিখিয়া যেমন করিত ঠিক তেমনি। হাত বাড়াইয়া আশা ডাকিতে লাগিল, এস, এস—মাণিক এস, আমার ধন এস—

খোকা আসে—আসে—এক পা দু'পা তিন পা করিয়া আসিতে থাকে—আবার আসে না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুষ্টুমি-ভরা চোখে চায়, মিটিমিটি হাসে। কোলে সে আসিল না।

চলে আয় ও দুষ্টু ছেলে, আসবি নে? ও খোকন, আসবি নে তুই আর?

দুই হাত বাড়াইয়া স্বপ্নাচ্ছন্ন আশা উঠিয়া দাঁড়াইল। ছেলে ঐ আঙুল মুখে পুরিয়া ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া হাবার মতো তাকাইয়া আছে। আকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়া আশা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ধরিয়া দেখে তার সাদা সেমিজটা টাঙাইয়া দেওয়া ছিল, তাহাই। ও মাগো—বলিয়া সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেই শব্দে শ্রীশের ঘুম ভাঙিল। উঠিয়া দেখে, আগের রাত্রির মতো আশা নিচে পড়িয়া আছে। জোরে জোরে ডাকিয়াও সাড়া পাইল না। আলো জ্বালিয়া দেখে, সে চোখ বুজিয়া আছে, আপাদ-মস্তক যেন বিদ্যুতের ছোঁয়ায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দাঁতে দাঁত লাগিয়া গিয়াছে। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে কতক্ষণ পরে আশা পাশ ফিরিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ও মাগো!

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শ্রীশ ডাকিতে লাগিল, ও আশা, আশা, একটা বার কথা বল। ভয় করছে?

না—না—বলিয়া যেন সহসা সম্বিৎ পাইয়া কাপড়-চোপড় গোছাইয়া আশা উঠিতে গেল। শ্রীশ বাধা দিয়া কহিল, উঠো না, ওখানে ওমনি থাক। পাটিটা পেতে দিচ্ছি। বাতাস করব?

সমস্ত রাত আলো জ্বালা রহিল। শ্রীশ একরকম জাগিয়া কাটাইল। মাঝে মাঝে একটু ঘুমের ভাব আসে, কিন্তু একটা-কিছু পড়িলে কি খুট করিয়া সামান্য কোন শব্দ হইলে অমনি সে লাফাইয়া উঠিয়া বসে। আশা সারারাত্রের মধ্যে আর গোলমাল করিল না। চোখ বুজিলেই যেন দেখিতে পায়, বড় বড় কোঁকড়ানো চুল—তার হারাণো খোকা ডাগর চোখ মেলিয়া মুখে আঙুল পুরিয়া খানিক একদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া মাকে দেখিতেছে। খানিক খানিক আবার চোখ নামায়। এক একবার আশা নিজেই ভাবে, এসব মিথ্যা—স্বপ্ন। তবু চোখ বুজিয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিল, মনের আনন্দে সে খোকাকে

দেখিতে লাগিল। আর মনে মনে ভাবে, রাত্রি যেন না পোহায়, ভোর যেন মোটে না হয়···

রোদে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে, তখনও শ্রীশ বিছানায় পড়িয়া ছিল। ঘরের মধ্যে চাকার ঘড়ঘড়ানি শুনিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, খোকার ঠেলা-গাড়িটা অযত্নে গত কয়েক দিন পড়িয়াছিল, আশা তাহার উপর রাশীকৃত পুতুল সাজাইয়াছে এবং সাটিনের সেই লাল জামাটি--যেটি খোকার গায়ে পরাইয়া দিয়া বছর দুই আগে এক বিজয়া-দশমীর দিন আশা বলিয়াছিল, গড় কর, ওঁকে গড় কর তো খোকা। সব বোঝে তোমার ছেলে। দেখবে, কি সুন্দর প্রণাম করবে এখন—

খোকা কিন্তু ঘাড় নোয়াইয়া আশা যে রকম চাহিয়াছিল সে ভাবে প্রণাম করিল না, দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কারের মতো একটা ভাব করিল। দুই রকমই সে শিখিয়াছে—কোনটা কখন করিতে হয়, ঠিক করিতে পারে না।

আশা হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

ওরে বোকা, গুরুজনকে বুঝি অমনি সেলাম করে? সাহেব হয়ে গেলি নাকি? খোকা আমার সাহেব—কেমন রঙ দেখেছ? ঠিক সত্যিকারের সাহেব। তুমি একটা টুপি কিনে দিও—লাল টুপি—

খোকাও দেখাদেখি হাসিয়া উঠিল। পদ্মের পাপড়ির মতো রাঙা ঠোঁট দুখানি চাপিয়া শব্দের শেষ দিকটায় অসঙ্গত জোর দিয়া সে এক ভঙ্গিতে মায়ের কথার উপর বলিয়া উঠিল, তুপ-পী-ই-ই—

সেই লাল টুকটুকে ছোট্ট জামা এবং লাল টুপিটিও ঠেলাগাড়ির উপর রাখিয়া ঘড়ঘড় করিয়া আশা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল।

শ্রীশ জিজ্ঞাসা করিল, ওসব কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

আঁস্তাকুড়ে—বলিয়া আশা বিষণ্ণ-দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। বলিল,

এক কাজ কর, তুমি এগুলো একেবারে গাঙের জলে ফেলে দিয়ে এস। যেখানে খোকা গেছে, তার জিনিসপত্তোরও যাক সেখানে।

শ্রীশ উঠিয়া আশার হাত হইতে গাড়ি সরাইয়া রাখিয়া কহিল, পাগল হলে আশা? তুমি এসব মোটেই আর ভাবতে পাবে না। এই শোন, আমার মুখের দিকে চাও একবার—

আশা বলিল, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, ভাবতে আমি চাই নে। সে ফি রাত্তিরে আসবে, আমি কি করব—এসে মা-মা—করে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকে। সে কি কম শত্তুর? নিজে গেল, এবার আমাকে নেবে। আজ তার কিছু আর এ বাড়ি রাখব না, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। ঐগুলো দেখলে ঘর যেন খালি ঠেকে, সেই সব ছাইভস্ম কথা মনে পড়ে যায়।

বলিয়া অবসন্নভাবে একখানা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। বলিতে লাগিল, দিনমানে এই আমাকে দেখছ এই রকম, আর রাত্তিরে যেন কি হয়ে পড়ি! সারা দিন ফন্দি আঁটি যাতে সে না আসে—কিন্তু শুয়ে আলো নিভিয়ে দিলেই অস্থির হয়ে পড়ি, মন ছটফট করতে থাকে। এ কি সাংঘাতিক রোগ? আমি মরে যাব—এবার আর বাঁচব না—আমাকে বাঁচাও তোমরা।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আশা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া হাসিবার চেষ্টায় বিকৃত মুখে বিকৃত স্বরে বলিল, আমি বলি কি, এ বাড়ি-ঘর-দোর সে চিনে ফেলেছে। এখান থেকে কিছু দিন পালিয়ে যাই চল। এমন দেশে যাব যেখানে সে যেতে পারবে না। এখন ছুটি চাইলে ছুটি দেবে না তোমাকে?

সেই দিনই শ্রীশ ছুটির দরখাস্ত দিল। বুড়া স্টেশনমাস্টারও সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, কচি বয়স, প্রথম শোক—তাই বড্ড বেজেছে। কিছু দিন কোন ভাল জায়গায় নিয়ে রাখগে, ঠিক হয়ে যাবেন। আমার মনে আছে শ্রীশ, যেদিন বিপিন ডাক্তার জবাব

দিয়ে গেল—বিকেল বেলার দিকটা ঝন্টুকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছি খান দুই কাপড় আর কি-কি কিনতে, দেখি মা-লক্ষ্মী ইঁদারার চাতালের উপর কলসি রেখে জল তুলছেন, মুখ শুকনো এতটুকু, আমায় দেখে ঘোমটা টেনে দিয়ে জল নিয়ে চললেন—আহা, যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি।

ইহার পর কয়েকটা দিন বেশ ভালই কাটিল, কোন গোলমাল নাই। আশা একেবারে সহজ সাধারণ মানুষ। সেদিন নাইট-ডিউটি সারিয়া শেষ-রাতে বাসায় আসিয়া শ্রীশ দেখিল, আশা জানলার উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আলো জ্বলিতেছে। ঘরে পা দিতেই অস্বাভাবিক উত্তেজিত স্বরে আরক্ত মুখে আশা বলিতে লাগিল, তুমি বিশ্বাস করবে না, সন্ধ্যে রাতে আমি রান্নাঘরে ছিলাম, ঘুমোই নি—স্বপ্ন দেখি নি—খোকা এসেছিল। আমায় কি বলল জান ?

সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো বলিয়া যাইতেছে, শ্রীশ শুনিতে লাগিল।

বলল, মা, আমায় দুটো ভাত দিবি ? এই দেখ্ গায়ে জ্বর নেই—গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দুটো ভাত খাব কাঁঠাল-বিচি ভাতে দিয়ে। আর বলল কি—

শ্রীশ চোখের জল সামলাইয়া লইয়া বলিল, চুপ কর, চুপ কর তুমি। আমি আর শুনব না—

বাধা পাইয়া আরও অধীরভাবে হাত-মুখ নাড়িয়া আশা বলিতে লাগিল, শোন, শোন, আমি বললাম, ও খোকা তুই কোথায় থাকিস ? সে হাত দিয়ে ঐ গাঙের দিক দেখিয়ে দিল। বলে, বড্ড কষ্ট হয় মা, কেবল সাগু আর বার্লি খেতে দেয়, ভাত খেতে দেয় না। এই দেখ, আমার গা জুড়িয়ে গেছে—তবু ভাত দেবে না।

শ্রীশ ভাবিল, আশা বুঝি সত্যিই পাগল হইয়া গেল।

খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, কিন্তু শ্রীশের আর খাওয়া-দাওয়া হইল না। কোন দিন কোন অবস্থাতেই আশা স্বামীর এতটুকু অযত্ন হইতে দেয় না। আজ যে বিকাল হইতে শুরু করিয়া এত খাটুনির পর সে অনাহারে বসিয়া রহিল, আশার সে খেয়ালই নাই। বাকি রাতটুকু তাহার কেবল ঐ একই কথা। খোকা আসিয়াছিল, সে খুব মোটা হইয়াছে, স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে, রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। খোকার গায়ে গোলাপি-সিল্কের ফ্রক, চুলে সিঁথি-কাটা। কপালে টিপ, চোখে কাজল। চোখ কচলাইয়া সারামুখে কাজল মাখিয়া ভূত হইয়াছে। খোকা কত কথা বলিল। কত হাসিল। উচ্চারণ তাহার এখন খুব স্পষ্ট হইয়াছে, আবার বাঁধুনি দিয়া বেশ পাকা পাকা কথা কহিতে পারে সে।

শ্রীশ অবিশ্বাস করিলে আশা উত্তেজিত হইয়া উঠে। তর্ক করিয়া ঝগড়া করিয়া জোর গলায় বুঝাইতে চায়, সে যাহা দেখিয়াছে, তাহা স্বপ্ন নয়—সত্য, অতি সত্য। অতএব শ্রীশ সায় দিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু রাত পোহাইবা মাত্র কোন দিকে না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি আশা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শ্রীশকে মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করিতেছে।

টিপি-টিপি বৃষ্টি শুরু হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক ফাঁকে গাঙের ঘাট হইতে আশা স্নান করিয়া আসিল। উঁকি-ঝুঁকি দিয়া দেখিল, রাত্রি-জাগরণের পর শ্রীশ এইবার শুইবার উদ্যোগে আছে। আশাকে দেখিতে পাইয়া হাসিমুখে কহিল, এই যে, এরি মধ্যে দিব্যি নেয়ে ধুয়ে···বা-রে!

সলজ্জ হাসিয়া আশা শিয়রে আসিয়া বসিল। একটু পরে স্বামীর চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে স্নেহ-সুকোমল কণ্ঠে কহিল, কি রকম রোগা হয়ে যাচ্ছ তুমি। ঘুম পাচ্ছে, না? যা

কাণ্ড লাগিয়েছি আমি। একটু ম্লান ভাবে হাসিল। বলিল, খান দুই লুচি ভেজে আনি—কাল রাত্রে তুমি কিচ্ছু খাও নি একেবারে। যাই—

শ্রীশ বলিল, তুমি যাচ্ছ নাকি? তা হলে কিন্তু খাব না—

আশার হাসিভরা মুখ এক নিমেষে অন্ধকার হইল। ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, এমন কপাল করে এসেছি···থাক, আমি যাব না। বামুন-মেয়েকে বলছি।

শ্রীশেরও দুঃখ হইল।

বলিল, রাগ করতে নেই লক্ষ্মী। তুমি ভাল হও আগে—তারপর যত খুশি রেঁধে খাইও। খাইয়েছ তো বরাবর। আচ্ছা, না হয়—মোটে দু'খানা। আমার ক্ষিদে নেই—দু'খানার বেশি না হয় যেন—

আশা মহা উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, দু'খানা নয়, দশ খানা।···আট খানার কম কিছুতে শুনব না। এই তো এতটুকুটুকু—ওর কমে কেমন করে পাতে দেব? আর একটুখানি হালুয়া—আর কিচ্ছু করব না, ভয় নেই গো—

শ্রীশ বলিল, যাও, শুনবে না তো? শরীরের অসুখ-বিসুখ—

অসুখ! ভারি ডাক্তার হয়ে পড়েছেন উনি! তোমার ডাক্তারিপনায় যাই যে কোথায়!

বলিয়া চঞ্চলপদে হাসিতে হাসিতে আশা বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন ডিস্ট্রিক্ট হইতে লোক আসিয়া শ্রীশের চার্জ বুঝিয়া লইল। ছুটি। বেলা তখন দু'টা-তিনটা। আনন্দ-দীপ্ত মনে শ্রীশ বাড়ি চলিল। জিনিস-পত্র কি আর বেশি—আজ রাত্রের গাড়িতেই রওনা হইয়া যাওয়া যাক। হঠাৎ এই খবর শুনিয়া আশা খুব উৎফুল্ল হইবে, চলিয়া যাইবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছে। দু-জনে মিলিয়া এখন হইতে বাঁধা-ছাঁদা শুরু করিলে আর কতক্ষণ?

শোবার ঘরে আশা নেই, রান্নাঘরও তালাবন্ধ। বামুন-মেয়েকে

জিজ্ঞাসা করিতে সে ভাঁড়ার-ঘর দেখাইয়া দিল। চমক দিবার অভিপ্রায়ে টিপি-টিপি সেখানে ঢুকিয়া শ্রীশ একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল, আর কথা বলিবার জো রহিল না।

জানালাহীন আধ-অন্ধকার ছোট্ট সঙ্কীর্ণ ঘরটি। তাহার মধ্যে খোকার পোশাক, জুতা-জামা, বল, মার্বেল, পুতুল, রেললাইন হইতে কুড়াইয়া-আনা একরাশ নুড়—সমস্ত মেজের উপর ছড়াইয়া দিয়া তাহাদেরই মাঝখানে আশা চুপ করিয়া বসিয়া আছে—কাঁদিতেছে না, নিঃশব্দ, নিশ্চল, বোধ করি বা চোখের পলকটিও পড়িতেছে না। ইহার চেয়ে আর্তনাদ করিয়া সে বাড়ি ফাটাইয়া ফেলে না কেন?

হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া আশা ভয়ানক অপ্রতিভ হইয়া গেল। চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, এই রকম ভাব। মুখ লাল করিয়া কৈফিয়তের ভাবে আপনা-আপনি বলিল, ভাবলাম—দুপুরবেলাটায় একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখি। তোমার তো ভাব জানি—কোন্ দিন হুস করে এসে বলবে, ছুটি মিলে গেছে—এক্ষুণি চল। বলিয়া সে একটুখানি হাসিল।

শ্রীশও পাল্টা একটু হাসিল।

সহসা আশা ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল। কহিল, দেখ কাণ্ড আমার। তুমি এসেছ, আর বসে বসে বাজে বকছি। এস খাবার দিই গে—

শ্রীশ বলিল, চল—

বাহিরে আলোয় আসিয়া শ্রীশ আশার হাত ধরিল।

শোন আশা—

মুখ ফিরাইতে শ্রীশের বেদনাহত মুখ আশার নজরে পড়িল। শ্রীশ বলিতে লাগিল, আমি একটা কথা জানতে চাচ্ছি, রোজই দুপুরবেলা তুমি এই রকম ওর জিনিস-পত্তোর ছড়িয়ে বসে থাক?

আশা ঘাড় নাড়িল এবং মুখেও কি একটা প্রতিবাদ করিতে

যাইতেছিল। শ্রীশ অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া বলিল, ফাঁকি দিও না। আমি বেরিয়ে গেলে তুমি রোজ ঐ রকম চুপ করে বসে থাক, না?

হাঁ-না—আশা কিছুই বলিতে পারিল না। একটু পরে কহিল, আহা, হাত ছাড় দিকি। খাবার তৈরী করা আছে, নিয়ে আসি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীশ কহিল, খাবার আনতে হবে না, তোমার, খাবার আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব।

আশাকে পাশে লইয়া সে খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাড়াতাড়ি দু'জনে মিলিয়া জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করিবার আর উৎসাহ রহিল না।

হঠাৎ শ্রীশের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে আশা কথা বলিল, কি রকম হাঁড়ি-পানা মুখ রে বাবা—ভয় করে। তুমি বড্ড দুষ্টু হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। এত সকাল সকাল এলে কি করে? পালিয়েছ বুঝি? কোনদিন স্টেশন-মাস্টার টের পেয়ে যাবে—আর গুরুমশায়ের মতো চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে যাবে। আমি ছোট্টকালে যে গুরুর কাছে পড়তাম ঠিক তোমার ঐ স্টেশন-মাস্টারের মতো তার দাড়ি ছিল—সত্যি!

শ্রীশ বলিল, ভুলোতে চাচ্ছ? জানি, আমি তোমার ব্যথার ব্যথী নই—

চুপ! বলিয়া আশা তাড়া দিয়া উঠিল। ক্ষণপরে শান্ত সুরে বলিল, ঐ রকম বললে আমার কত কষ্ট হয় জান? আজকে জিনিস গুছোতে গেছলাম। ওর ঐ পুতুল-টুতুল নামিয়ে নিয়ে হাত যেন অবশ হয়ে গেল, কিছুতে আর হাত তুলতে পারলাম না। বলিতে বলিতে স্বর উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, দোষ তো তোমারই। তুমি গা করছ না। গাঙের জলে ফেলে দিয়ে এস—আমি বাঁচি।

সারা বিকাল দু'জনে খুব খাটিয়া বাক্স-পেঁটরা গোছাইয়া সন্ধ্যার

দিকে নদীর ধারে একটু বেড়াইতে বাহির হইল। সে দিকে লোকজন কেহ নাই। এই রকম মাঝে মাঝে তাহারা বেড়াইত।

আশা জিজ্ঞাসা করিল, ছুটি তো নিলে—কোথায় যাওয়া যাবে? এক্ষুণি ঠিক করে ফেল।

শ্রীশ বলিল, পুরী। সমুদ্দুরে নাওয়া—সে যে কি আরাম তুমি জান না আশা, ঠিক যেন নাগরদোলায় চেপে দুলতে দুলতে ফিরে এসে বালির বিছানায় গড়িয়ে পড়া—

আশা বলিল, না, পাহাড়ে যাই চল—দার্জিলিং কি আর কোথাও।

বলিতে বলিতেই ছাঁৎ করিয়া মনে আসিল, অসমতল পাহাড়ের দেশে খোকাকে লইয়া চলাফেরা করা যাইবে না তো। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল, খোকা যে নাই। এক বছর আগে এই স্টেশনে 'আসিয়াছিল তাহারা তিন জনে। আজ রাত্রে অবোধ বালকটিকে রেল-লাইনের ও-পারে বুড়ী ভৈরবীতলায় গাঙের কোলে একলা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

আশা বলিল, তা যেখানে হয় হোক গে—আজই যেতে হবে। কিন্তু শেষটা যে তুমি বলে বসবে, গোছানো হয়ে উঠল না—

শ্রীশ কহিল, কাপড়ের বোঁচকা কটা বেঁধে নিলেই তো হয়ে গেল, আর কি? গাড়ি সেই রাত দুটোয়। খুব হয়ে যাবে।

আশা বলিল, খুব, খুব, ভারি তো! আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি সব ঠিক করে দেব। আর বেড়াব না—চল দিকি বাড়ি—

উৎসাহ ভরে আশা আগে আগে চলিল। কয়েক পা চলিয়া আবার গতি মন্দ হইল।

একটা কথা বলব, রাগ করবে না?

কি?

আশা বলিতে লাগিল, একটু ঘুরে যাই চল। যেখানে খোকাকে তোমরা রেখে এসেছিলে সেই জায়গাটা একবার দেখব। আর

তো কোন ভয় রইল না। আজ চলে যাচ্ছি, কতদিন পরে আসব, শরীরের যে দশা—এ জন্মে আর আসি না আসি, তুমি রাগ কোরো না।

শ্রীশ আপত্তি করিল না। বলিল, চল—

চারিদিকে দু'দশখানা পোড়া কাঠ, ভাঙা কলসি, ভাঙা খাটিয়া। আজই বোধ হয় একটা চিতা পুড়িয়াছে, তাহার চিহ্নাবশেষ। শ্রীশ চাহিয়া দেখিল, আশার চোখ অস্বাভাবিক রকম প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌খানে? কোন্‌খানে?

এতক্ষণে শ্রীশ বুঝিল, আশাকে এখানে আনা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। বলিল, এখানে নয়—আগে আর একটা শ্মশান আছে সেখানে। রাত হয়ে এল, আজ আর যাওয়া যাবে না।

আমি যাব—

শ্রীশ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, না—চল, ফিরে যাই।

এক ঝাঁকিতে হাত ছাড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে আশা কহিল, বাড়ি আমি যাব না, খোকনের জায়গা না দেখে যাব না আমি বাড়ি। এই আমি বসলাম, নিয়ে যাও দেখি কেমন।

সেই শ্মশানঘাটায় এখানে-সেখানে মানুষের মাথা, পাঁজরার হাড়, জঙ্গল, বর্ষার জল-কাদা—তাহার মধ্যে আশা বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন আশা জিজ্ঞাসা করিল, আমায় নিয়ে যাবে না তা হলে?

আজ নয়।

তবে চল বাড়ি।

বাড়ি ফিরিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে হাসিয়া শ্রীশ বলিল, খিদে যা পেয়েছে আশা, একটু উঠে দাও না কিছু—

আশা নড়িল না, নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শ্রীশ বলিতে

লাগিল, হাত-পা কোলে করে বসে রইলে, বেশ তো লোক! বড় যে বলছিলে, আধ ঘণ্টার মধ্যে বেঁধে-ছেঁদে সব ঠিকঠাক করে দেবে! কেবল তোমার মুখের বড়াই।

আশা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, আমি পারব না। যাও—

আচ্ছা তুমি থাক, আমি করছি—

বলিয়া শ্রীশ আলনার সমস্ত কাপড়ের রাশ মেজেয় ফেলিয়া ভাঁজ করিতে লাগিল। আশা বসিয়া বসিয়া তাই দেখিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বাজপাখীর মতো ছুটিয়া আসিয়া যেন ছোঁ মারিয়া তার হাতের কাপড় কাড়িয়া লইয়া কান্না ভরা গলায় বলিল, কত জ্বালাবে আমায় শুনি? আমায় খুন ক'রে কেন?

চুলগুলি অবিন্যস্ত, মুখচোখ লাল হইয়াছে। শ্রীশকে সরাইয়া ফেলিয়া দিয়া সেই কাপড়ের বোঝার মধ্যে আশা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল

সহসা আর্তনাদের মতো বলিয়া উঠিল, মাগো মা—কি নিষ্ঠুর তুমি, কি পাষাণ তুমি, আমায় দেখালে না—

শ্রীশ বিকৃত কণ্ঠে বলিল, আশা, তোমায় মিথ্যেকথা বলেছিলাম। যেখানে গিয়েছিলাম, ওখানেই—

ওখানেই? দেখিতে দেখিতে আশার মুখের ভাব অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছুটিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া মুখের একেবারে কাছে মুখ আনিয়া বারম্বার প্রশ্ন করিতে লাগিল, ওখানে? ওগো, ঠিক বলছ ওখানে? ওখানে আমার খোকামণিকে রেখে এসেছ? কোন্‌খানটায় বল তো—কেয়াঝাড়ের পাশটায়, না?

শ্রীশ আশাকে টানিয়া বুকের উপর আনিল। তারও কান্না পাইতেছিল।

হাত-মুখ নাড়িয়া আশা বলিতে লাগিল, আমি তা জানি। তখনি ভেবেছিলাম। ঐ কালো কালো কেয়ায় জঙ্গল, শুঁড় উঠেছে—যেই

গিয়েছি অমনি যেন ডেকে উঠল, মা—তুমি ঢাকলে কি শুনি? আমি স্পষ্ট শুনেছি—আমি তাকে দেখেছি—কসাড় জঙ্গলের মধ্যে কেষ্ট ঠাকুরের মতো। যাবে আর একবার?

বামুন-মেয়ে, বামুন-মেয়ে—বলিয়া শ্রীশ বার কয়েক ডাকাডাকি করিল। সে আসে নাই। তখন শ্রীশ কোলের উপর আশাকে শোয়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল। আর যে কি করিতে হইবে, বুঝিতে পারিল না।

আশা জড়াইয়া জড়াইয়া বলিতে লাগিল, যেন ফিশ-ফিশ করে বলল, মা, আমাকে ফেলে যাচ্ছিস, একলা একলা ভয় করবে আমার। কড়ির পুতুলগুলো দিয়ে যাস—খেলবো।

বলিতে বলিতে থামিল। সহসা কোল হইতে সজোরে মাথা তুলিতে গেল। বলিল, বুড়ো বয়সে তোমার এ কি রকম! খোকা যদি এসে পড়ে কি লজ্জা—মাগো! তুমি সরে গিয়ে বোসো।

বাতাস করিতে করিতে অবশেষে আশা চোখ বুজিল। একটু দেখিয়া আস্তে আস্তে মাথা নামাইয়া নিচে একটা বালিশ দিয়া শ্রীশ ডাক্তারকে ব্যাপারটা জানাইবার জন্য বাহির হইল।

ফিরিয়া আসিতে রাত একটু বেশি হইল। আসিয়া আশাকে পাওয়া গেল না। বামুন-মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিতে সে আকাশ হইতে পড়িল।

ও মা, আমি তা তো জানি নে, আমি ওদিকে ছিলাম। আর আমি ভাবলাম, আপনারা বেড়াতে গেছেন। হয়তো নগেনবাবুর বাড়ি গেছেন, এখনও ফেরেন নি—

কোনদিন কোন অবস্থাতেই যে আশা একা-একা বাড়ির গণ্ডি ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহা কল্পনাতীত।

ঘর-দুয়ার পাতি-পাতি করিয়া দেখা হইল। বাহিরে বড় অন্ধকার।

নদী-পারে ঘন কালো মেঘ করিয়াছে। লণ্ঠন হাতে লইয়া গাঙের ধারে ধারে শ্রীশ ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল, আশা, ও আশা—

লণ্ঠন ফিরাইয়া হঠাৎ দেখিল, সাদা কাপড়-পরা একজন বউ মতো গাঙের অনেক জলে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। লণ্ঠন রাখিয়া সে জলে নামিল। কাছে গিয়া দেখিল, এক বোঝা পোয়াল, জোয়ারের টানে কোনখান হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে।

এমন সময় ঝণ্টু চাপরাসি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল, মা ঠাকরুন বাড়িতেই আছেন। নিচে হইতে উঠিয়া ছাতের উপর গিয়া ঘুমাইয়াছিলেন। এখন জাগিয়া বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ছাতে গিয়া খুঁজিয়া দেখার কথাটা কাহারও মনে হয় নাই বটে!

খোলা হাওয়ায় অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া আশা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সে সেই রাশীকৃত কাপড় একা-একা ভাঁজ করিয়া বোঁচকা বাঁধিতেছিল। শ্রীশকে দেখিয়া সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে হাসিয়া বলিল। আজই যাব কিন্তু গাড়ির এখনো ঢের সময় আছে।

গাড়ি আসিলে ঝণ্টু মেয়ে-গাড়ির বেঞ্চের উপর লম্বা বিছানা করিয়া দিল।

আশা চারিদিক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল, গাড়ির মধ্যে একটি প্রাণীও জাগিয়া নাই, যে যার মতো জায়গা লইয়া ঘুমাইয়া আছে। শ্রীশ পাশের গাড়িতে রহিল।

গুম-গুম করিয়া গাড়ি পুলের উপর উঠিতে তাড়াতাড়ি সে জানলা দিয়া মুখ বাহির করিল। দেখিতে দেখিতে স্টেশনের আলো, নিচে গাঙের নৌকায় ক্ষীণ টেমির আলো, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় নদী-স্রোতের ঝিকিমিকি—সমস্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর আশা শুইয়া পড়িল।

চাকায় চাকায় লাইনের উপর বাজিতেছে। কি জোরে গাড়ি চলিয়াছে, উঃ! রোজ দুপুর রাত্রে আমরা যখন ঘুমাই, এ গাড়ি এমনি তো চারিদিক তোলপাড় করিয়া ছুটিয়া চলে। আজও জগৎশুদ্ধ ঘুমাইতেছে, আর কতলোককে লইয়া গাড়ি চলিয়াছে!

মরিয়া গেলে মানুষ কোথায় যায়? মরিবার পর কি তারা দৌড়িতে পারে? রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া দৌড়িতে পারে? বুড়ীভৈরবীর শ্মশানঘাট হইতে পোল কি দেখা যায়? আজ বিকালে কিন্তু নজর পড়ে নাই। যদি এই সময়ে পুলের উঁচু কিনারাটায় দাঁড়াইয়া কেউ কাঁদিয়া উঠিত—ও মা, কোথায় যাচ্ছিস? কোথায় চললি আমায় ফেলে? ও রাক্কুসী?

মাঝে মাঝে স্টেশনে গাড়ি থামে, লোকজনের উঠা নামা, হৈ-চৈ ঘণ্টার বাজন···আবার গাড়ি হুস-হুস করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে মাঠের মধ্য দিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া।

ঠাণ্ডা মাঠের বাতাসে ঘুম ক্রমে আঁটিয়া আসিল, আশা আর কিছু জানিতে পারিল না।

তখনো ভাল করিয়া ফর্শা হয় নাই, গাড়ির মধ্যে অল্পবয়সি আর একটি বধূ জাগিয়া উঠিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া কলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, ও দিদি, দেখ—খোকার কাণ্ড দেখ। আমি জানি, তোমার কাছে শুয়ে রয়েছে। ও মা আমার কি হবে—দস্যি ছেলের আপন পর জ্ঞান নেই, একবিন্দু অচেনা নেই, ঐ বউটির কোলে যেমন নেতিয়ে রয়েছে, দেখ না—যেন ওরই ছেলে। কখন গেল?

ওদিকের বেঞ্চে প্রৌঢ়া মহিলাটি বিপুল বপু লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, তাই নাকি? আমারই ভুল ছোটবউ। বেশ ছিল আমার কাছে ঘুমিয়ে—তারপর দেখি খোকা আমার চোখের পাতা ধরে টানছে। বলে, মা যাব। পাশ ফিরে শুয়ে

আছে বউটি, দেখতে অবিকল তোর মতো। আমি চিনতে পারি নি—ওকেই দেখিয়ে দিলাম। খোকা কোলে গিয়ে শুয়ে পড়ল, আর বউটাও অমনি আলগোছে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিল। বউটারও কিন্তু আচ্ছা ঘুম।

ঘুমের মধ্যে আশার মনে হইল, তাহার নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্য হইতে খোকাকে কে ছিনাইয়া লইতেছে। আরও ব্যগ্রভাবে ছেলেকে বুকের মধ্যে চাপিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, কে ?

তাহার ভাব দেখিয়া খোকার মা একটু থমকিয়া গেল। বলিল, খোকাকে নিয়ে যাব এইবার—

কেন ? কেন ? বলিয়া আশা ঝোঁকের মাথায় উঠিয়া বসিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া প্রথমটা ব্যাপার বুঝিতে পারে নাই।

বধূ বলিল, ইস্টিশান এসে পড়ল, এইবার আমরা নেবে যাব। সেই নিমতে-গৌরীপুর যেতে হবে, ইস্টিশানে গরুর গাড়ি এসে থাকবার কথা। কি রকম ভালমানুষের মতো আপনার কোলের উপর পড়ে আছে দেখছেন, অথচ ওর যে দুষ্টুমি। কি আর বলব, এই হচ্ছেন আমার বড়জা, খোকনের জেঠাই মা। ও দিদি, এই জুতো পড়ে রয়েছে—নামবার সময় হাতে করে নিয়ো তুমি। খোকনবাবু, চোখ মেল, বাড়ি যাবে না ? ওঠ—

খোকা জাগিয়া অচেনা মানুষ দেখিয়া আশার কোল হইতে মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আশা হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল, বাড়ি যাচ্ছ খোকনবাবু ? এসো তো জুতো পরিয়ে দিই—বাবু হয়ে বাড়ি যেতে হয়।

যাঃ—

বলিয়া তাহার কচি হাতের আঘাতে খোকা আশার প্রসারিত হাত সরাইয়া দিল।

জংশন-স্টেশন। গাড়ি অনেকক্ষণ থাকে। ইঞ্জিনে জল লইতে লাগিল। পাশের কামরা হইতে একজন পুরুষ অভিভাবক নামিয়া আসিয়া ছেলেটিকে কোলে লইল। বউটি ও তাহার বড়জা সাবধানে নামিয়া পুরুষটির পিছে পিছে প্লাটফরম পার হইয়া ছই-দেওয়া গরুর গাড়িতে গিয়া উঠিল। আশা দেখিতে লাগিল।

বৈশাখের শেষ। সোনার বরণ ডাঁসা খেজুর-ভরা খেজুর-বন, ছড়া-বাঁধা হলদে হলদে সোঁদালফুল, বাবলাফুল, বেগুনি রঙের আকুন্দফুল, শিরিষগাছ-ভরা অগুন্তি সূঁচের মতো শিরিষফুল, ডগমগে লাল কৃষ্ণচূড়ার ফুল। পেঁপেতলায় ছোট্ট একটি কুঁড়ে, তার ও-পাশে কাল গরু একটা, টিনের ঘর, কলাবাগান, তালবনে গাছে গাছে কচি তাল পড়িয়াছে। তার পাশ দিয়া মেটে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তারপর মাঠ—মাঠ—মাঠ, উলুক্ষেত—

গরুর গাড়ি ক্যাঁচ-কোঁচ করিয়া খেজুরবন তালবনের ফাঁকে ফাঁকে মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। বাঁকের মুখে একটা অশ্বত্থগাছের আড়ালে খানিকক্ষণ অদৃশ্য হইল, তারপর আবার দেখা গেল। গাড়ি চলিতেছে—চলিতেছে—চলিতেছে—ক্রমশ দূর হইতে দূরতর হইয়া যাইতেছে। চাকার ধূলায় ধূলায় পিছনটা অন্ধকার।

রায়রায়ানের দেউল

ক্রোশ-দশেকের ভিতর গ্রাম নাই, দিগন্ত-বিসারী পাকসির বিল। চৈত্র-বৈশাখেও এখানে-সেখানে পানাভরা জল, খানিকটা বা পাঁক—রাত্রে ঐ সব জায়গায় আলেয়া জ্বলে। তখন মানুষ-জন কেহ ওদিকে যায় না, যাইবার উপায় থাকে না। সুপারিকাঠের ছোট ছোট নৌকা ও তালের ডোঙা গ্রামের কিনারে ফাঁকায় পড়িয়া পড়িয়া শুকায়।

বর্ষায় ভরা-বিলের আর এক মূর্তি! শোলা কলমিলতা ও চেঁচো-ঘাস জাগিয়া ওঠে; ডোঙা ছুটাছুটি করে হাজারে হাজারে। এ অঞ্চলের লোকের হামেশাই কিল্লাবাড়ির গঞ্জে যাইতে হয়। বিল ঘুরিয়া অতদূর যাইতে হাঙ্গামা অনেক। বর্ষার সময়টা সোজা বিল পাড়ি দিয়া যাওয়ার বড় সুবিধা।

গ্রাম ছাড়াইয়া ক্রোশ-দুই আগাইলে দেখিতে পাইবে, অনেক দূরে জলের মধ্যে সবুজ সুউচ্চ দ্বীপের মতো খানিকটা। তার উপর বড় বড় তালের গাছ আকাশ ফুঁড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। আরও আগাইয়া দেখিবে, ঝোপ-জঙ্গল, ঘরের মটকার মতো উঁচু মাটির স্তূপ, মানুষে নাগাল পায় না এমনি অজস্র নলবন বাতাসে বাজিতেছে। সামনে পিছনে ডাহিনে বাঁয়ে সাঁ-সাঁ করিয়া জল কাটিয়া ডোঙা ছুটিতেছে, ঠক-ঠক করিয়া কাঠের উপর লগির আওয়াজ···দ্রুত গমনশীল মানুষে মানুষে পলকের জন্য চোখোচোখি···কদাচিত দু-এক টুকরা আলাপন। নিশব্দতার অতলে কথার ধ্বনি ডুবাইয়া দেখিতে দেখিতে আরোহীগুলি মুহূর্ত-মধ্যে নলবনের ফাঁকে ফাঁকে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আস্তে ভাই, সামাল—পাথরে ডোঙার তলা ফাঁসবে।

তাইতো বটে! নূতন কেহ ডোঙা চালাইতে আসিলে এমন পাথর দেখিয়া চমকিয়া ওঠে।

পাহাড় নাকি?

না, রায়রায়ানের দেউল।

বিলের সে দিকটা একেবারে ফাঁকা, একগাছি ঘাসের আগাও নাই। কিন্তু ভোরের দিকে সেখানে গিয়া পড়িলে আর চোখ ফিরাইবার উপায় থাকে না। সাদা বেগুনি লাল রঙের সাপলা ফুলের মধ্যে পথ হারাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া যাইতে হয়। জলের মধ্যে বড় বড় পাথরে-খোদা ভাঙা-চোরা কত মূর্তি···ময়ূরে সাপ ধরিয়াছে—ময়ূরের ঠোঁট আছে, পা নাই···পদ্মফুল—পাপড়িগুলি ভাঙিয়া থ্যাবড়া হইয়া গিয়াছে···হাত ও নাক ভাঙা উড়ন্ত অপ্সরী অল্প অল্প মাথা জাগাইয়া আছে।

আহা-হা, এমন দেউল ভাঙল কে গো?

রায়রায়ান নিজেই।

এই যে ভাঙা দেউল, এখান হইতে অনেক—অনেক দূরে একটি গ্রাম। সে গ্রামের নাম আজকালকার লোকে বলিতে পারে না। একদিন শেষ রাতে সুন্দরিকাঠের ভরা আসিয়া লাগিল সেই গ্রামের ঘাটে। বর্ষার দুর্গম পথ, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে। সকলে মানা করিল, রাতটুকু নৌকায় কাটাইয়া সকালবেলা বাড়ি যাইও। রামেশ্বর শুনিল না—সাত দিন আজ বাড়ি ছাড়া, ঘরে তরুণী বউ। আর মা-বাপ মরা ছোট বৈমাত্রেয় ভাইটি। যাবার বেলা বধূর চোখে জল দেখিয়াছিল, অনেক রকম আবদার ছিল তার। নৌকা খুলিয়া দিয়াও সেদিন রামেশ্বর ভাবিতেছিল—কাজ নাই এই কাঠের ব্যবসা করিতে গিয়া; নামিয়া

যাই। ভাবনাকুল মনে ছপ-ছপ ছপ-ছপ দাঁড় ফেলিয়া পুরা আটটি দিন ও সাত রাত্রি আগে তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।...

পিচ্ছিল পথে আছাড় খাইয়া জল-কাদা মাখিয়া অনেক দুঃখে অবশেষে রামেশ্বর বাড়ি আসিল। হঠাৎ চমকাইয়া দিবে এই মতলবে আগে কাহাকেও ডাকিল না, টিপি-টিপি খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় উঠিল। সবল দু'টি বাহু দিয়া নড়বড়ে দরজায় দিবে এইবার প্রচণ্ড ঝাঁকি। ঘুম উড়িয়া গিয়া ঘরের মধ্যে উঠিবে ভয়ার্ত কোলাহল। তারপর বাহির হইতে পরিচিত উচ্চকণ্ঠের হাসি ফাটিয়া পড়িবে। তারপর দীপ জ্বলিবে। তারপর—

দরজায় ঘা দিতে রামেশ্বর হুমড়ি খাইয়া ঘরের ভিতর পড়িল। খোলা দরজা। কেহ নাই। বউকে আর কি বলিয়া ডাকিবে, অন্ধকারে ভাইটির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, মধুকর, মধুকর !...

সে রাত্রি কাটিয়া দিন আসিল। এবং মধুকরেরও খোঁজ হইল। জ্ঞাতিসম্পর্কের এক খুড়া তাহাকে বাড়িতে লইয়া রাখিয়াছেন। খোঁজ হইল না কেবল বধূটির, যাবার দিন বড় কান্না কাঁদিয়া যে বিদায় দিয়াছিল। তারপর দু'দিন ধরিয়া গ্রামের মঙ্গলার্থীরা দলের পর দল অফুরন্ত উৎসাহে রামেশ্বরকে সমবেদনা জানাইয়া যাইতে লাগিলেন। বড় অসহ্য হইল। আবার এক রাত্রিশেষে পাঁচ বছরের ভাইটির ঘুম ভাঙাইয়া রামেশ্বর তাহাকে কাঁধে তুলিল, দীর্ঘ লাঠিগাছটি লইয়া তারার অস্পষ্ট আলোকে সাঁকোর উপর দিয়া সে চোরের মতো গ্রাম-নদীটি পার হইয়া গেল। মনের ঘৃণায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কুড়ি বছর পড়ে ঘোড়ায় চড়িয়া লোকজন সৈন্যসামন্ত লইয়া ফিরিয়া আসিলেন রায়রায়ান রামেশ্বর। আজমীরের এক বৃদ্ধ সেনানীর বুকে ছুরি মারিয়া ঘোড়াটি কাড়িয়া আনা। নাম তার

কুণ্ডল, সে কী ঘোড়া! এক তাল উঁচু, ছুটিবার সময় যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলে। এই কুড়ি বছর রামেশ্বর ভাগ্যের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করিয়াছেন, কপালের উপর বঙ্কিম বলিরেখায় অবোধ্য অক্ষরে সেই সব দিনের কত কি ভয়ঙ্কর কাহিনী লেখা রহিয়াছে। রায়রায়ান জায়গির লইয়া আসিয়াছেন, সেই জায়গিরের দখল লইয়া প্রথমেই বাধিল ভরত রায়ের সঙ্গে।

ভদ্রার দক্ষিণ পারে খালের মুখে ভরতগড়। কিল্লাবাড়ি হইতে ফৌজদারের কামান আনিয়া প্রাকারের ধারে বসানো হইয়াছে। প্রথম দু-দিন খুব তোপ দাগা হইয়াছিল। এখন চুপচাপ। ভরত রায়ের লোক প্রাকারের মুখ কাটিয়া দিয়াছে, গড়ের চারিদিক নদীর জলে কানায় কানায় ভর্তি। ভিতরে কি একটা কাণ্ড চলিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে তাহার একবিন্দু আঁচ পাইবার যো নাই।

সেদিন বড় অন্ধকার রাত্রি। রায়রায়ানের ঘুম নাই। শিবির হইতে খানিকটা দূরে ভদ্রার কূলে আপনার মনে পায়চারি করিতেছেন। হঠাৎ খস-খস-খস—রায়রায়ানের কান খাড়া হইয়া উঠিল, কেয়া-ঝাড়ের ভিতরে অতিশয় ক্ষীণ যৎসামান্য আওয়াজ। প্রবল জোয়ারের টান—তাহাতে যে ঐ শব্দটুকু না হইতে পারে এমন নয়। রামেশ্বরের তবু সন্দেহ হইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঠিক! কেয়া-জঙ্গলের নিবিড় ছায়ার মধ্যে আগাগোড়া আবৃত করিয়া একখানা বজরা অতি চুপি-চুপি উজান ঠেলিয়া যাইতেছে। কাহাকেও ডাকিলেন না, নিজের বিপদের আশঙ্কা মনে হইল না, ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি আগাইতে লাগিলেন। পরিখার মুখে আসিয়া পথ আটকাইল। সেখান হইতে দেখিতে লাগিলেন—চোখ অন্ধকারে জ্বলিতে লাগিল—দেখিলেন, নৌকা নিঃশব্দে গড়ের পিছনে সঙ্কীর্ণ নালার মুখে আসিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই কয়টি সাদা পুঁটলি নালায় গড়াইয়া আসিয়া নৌকায় পড়িল,

আর চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে নৌকা পাক খাইয়া সুতীব্র জলস্রোতে বিদ্যুতের বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রায়রায়ান ছুটিতে ছুটিতে তাঁবুর দিকে ফিরিলেন। খানিকটা দূরে একটি কেওড়া-গুঁড়িতে ঠেশ দিয়া মধুকর মৃদুস্বরে বাঁশী বাজাইতেছিল; বড় মধুর বাঁশী বাজায় সে। দ্রুত পদশব্দে চমকিয়া তাহার হাতের বাঁশী পড়িয়া গেল। নিঃশব্দে মধুকর দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

চলো—

কোথায়?

রানায়ের মোহানায়।

রানায়ের মোহানা ক্রোশ পনের-ষোল দূর। গাঙটা সেখানে চারিমুখ হইয়া গিয়াছে। ভরত রায়ের সঙ্গে দেবগঙ্গার চাকলাদারের সম্প্রীতি খুব বেশি। নৌকা যদি সে দিকে যায় তবে রানাই হইতে ডাইনে মোড় ঘুরিবে। স্থল-পথে আগে গিয়া সেখানে ঘাটি দেওয়া দরকার।

মুহূর্ত মধ্যে আটজন ঢালিসৈন্য প্রস্তুত হইয়া মাঠের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অশান্ত কুণ্ডল মাটির উপর খুব দাপাইতে লাগিয়াছে। এতক্ষণে রায়রায়ানের মুখে হাসি ফুটিল। ঘোড়ার কাঁধে করাঘাত করিয়া বলিলেন, থাম্—থাম্ বেটা, সবুর সয় না বুঝি! আচ্ছা, আমি চললাম আগে আগে, তোমরা এস শিগগির—

মাঠ ভাঙিয়া কুণ্ডল ছুটিল। নদীকূলে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া রামেশ্বর মোহানার মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধুকরেরা পৌঁছিল যখন কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ দেখা দিয়াছে। নিষুপ্ত জেলেপাড়া, ঘাটে অগণিত ডিঙা বাঁধা। এক একটা ডিঙার ছইয়ের মধ্যে সকলে প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। রাত্রি শেষ হইয়াছে, ঝাপসা-ঝাপসা জ্যোৎস্না। সেই সময়ে জলের উপর বজরার ছায়ামূর্তি দেখা দিতেই—গুড়ুম!

বজরা হইতেও জবাব আসিল। তীরের উপর গাছে গাছে পাখিরা ত্রস্ত হইয়া কলরব শুরু করিয়াছে। অকস্মাৎ অনেকগুলি কণ্ঠের আর্তনাদ···ঝপ-ঝপ শব্দে মাঝ-নদীর জল ছিটকাইয়া উঠিল···বজরা চরকির মতো পাক খাইতে লাগিল। রামেশ্বর তীব্র আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, হাসিল!

দশটি ডিঙা সকল দিক হইতে বজরা ঘিরিয়া ধরিল। জল রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে। একটি শবের কাল চুল জলের টানে একবার ভাসিয়া সেই মুহূর্তে অতলে তলাইয়া গেল। মাল্লা ক'জন গলুয়ে পড়িয়া কাতরাইতেছে। মধুকর লাফাইয়া ভিতরে ঢুকিল, ক্ষণপরে বাহির হইল ছোট একটি তোরঙ্গ লইয়া।

সমস্ত এই?

মধুকর বলিল, হাঁ দাদা, তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি—আর কিচ্ছু নেই—এস দিকি।

রামেশ্বরও ঢুকিতে যাইতেছিলেন, ইঙ্গিতে মধুকর নিরস্ত করিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, ওর মধ্যে রয়েছেন ভরত রায়ের স্ত্রী-কন্যা আর গড়ের আরও জন পাঁচ-সাত মেয়েলোক—

বজ্রকণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন, ডাক দেও পুরুষলোক যে আছে—

মধুকর বলিল, পুরুষ কেউ নেই। ভরতের মেজ ছেলে ওঁদের নিয়ে পালাচ্ছিলেন, তিনি ঘায়েল হয়ে ভেসে গেছেন। ভয়ে সকলে এখন মড়ার মতো। আপনি আর যাবেন না ও-দিকে।

মুহূর্তকাল ভাবিয়া রায়রায়ান কূলে নামিয়া আসিলেন। এক-জনকে বলিলেন, খোল তো তোরঙ্গ। দেখি আমাদের ছোট রায় কি নিয়ে এলেন।

ডালা তুলিতেই মণিমুক্তা ঝক-ঝক করিয়া উঠিল। খুশিমুখে মধুকরের পিঠে থাবা দিয়া রামেশ্বর বলিলেন, বেশ, বেশ! এবারে তুমি নিজে রামনগর চলে যাও—তোরঙ্গসুদ্ধ দেওয়ানজির হাতে দাও

গিয়ে—গড়ের কাজে টাকার অভাব আর হবে না।—আর এঁরা থাকবেন বন্দিশালায়—কোন অসুবিধা না হয়, দেখবে—

মনের আনন্দে রামেশ্বর কুণ্ডলের পিঠে গিয়া বসিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বেই রায়রায়ানের গোলায় ভরতগড় ধ্বসিয়া চুরমার হইয়া গেল। সেদিক দিয়া না আসিল কোন প্রতিবাদ, না পাওয়া গেল একটা মানুষের সাড়া-শব্দ। অনেক কষ্টে পরিখা পার হইয়া সৈন্যেরা গড়ে ঢুকিয়া দেখে, যা ভাবা গিয়াছিল তা-ই—সকলে পলাইয়াছে, জিনিসপত্র কিছুই পড়িয়া নাই, বারুদখানায় পয়ঃপ্রণালী খুলিয়া খালের জল তোলা হইয়াছে, গড়ের শূন্য কক্ষগুলি খাঁ-খাঁ করিতেছে।

বিজয়োল্লাসে রামেশ্বর রামনগর ফিরিয়া চলিলেন।

নিজ নামে নগরের পত্তন মাত্র হইয়াছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে কাজ বড় বেশি অগ্রসর হইতে পায় নাই। অসমাপ্ত চত্বরের প্রান্তে অতি-প্রাচীন একটা বকুল-গাছ। শ্রান্ত রামেশ্বর অপরাহ্ণ বেলায় প্রাসাদকক্ষ হইতে নবনির্মিত নগরীর দিকে অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন, অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, চত্বরের প্রান্তে বকুলের ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে অপ্সরির মতো লঘুগামিনী বড় রূপসী একটি মেয়ে। মধুকর কি কাজে সেইখানে আসিয়াছিল, রায়রায়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ও-টি ?

ভরত রায়ের মেয়ে।

রামেশ্বর ভাইয়ের দিকে তাকাইলেন, মুখের উপর দিয়া কৌতুক-হাস্য মৃদু খেলিয়া গেল। বলিলেন, বন্দীশালায় বন্দীদের রাখবার নিয়ম। এ কি করেছ ?

কিন্তু নিয়ম হইলেও এ ছাড়া যে অন্য উপায় ছিল না, মধুকর প্রাণপণে তাহা বুঝাইতে লাগিল। কারণ বন্দীশালাটা ঠিক নিরাপদ নয়···তা ছাড়া সেখানে থাকার অসংখ্য অসুবিধা যে রাখাই চলে না···

রামেশ্বর তবু মৃদু হাসিতেছেন দেখিয়া আরও বিব্রত ভাবে মধুকর বলিল, আপনি দেখেন নি তাই। দেখতেন যদি—সে যে কি ভয়ানক কান্নাকাটি --

কান্নাকাটি? খুব ভয়ানক? রামেশ্বর সহসা সোজা হইয়া বসিলেন, মুখের কৌতুক-হাস্য নিভিল, চোখ জ্বল-জ্বল করিয়া উঠিল। ম্লান অপরাহ্ণ-আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন অর্ধসমাপ্ত বিস্তীর্ণ নগরী···পশ্চিমে মাঠের প্রান্তে রক্তিম আভা বিলের জলে ডগমগ করিতেছে···দূরে সীমাহীন নিবিড় অরণ্যশ্রেণী। বিশ বছর আগেকার একটি গরিব খোড়ো-ঘর অকস্মাৎ রায়রায়ানের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে বিদায়-যাত্রার আয়োজন, কথা নাই,—নির্বাক বিদায়-চিত্র। ঘাটে সুন্দরী-কাঠ আনিবার নৌকা প্রস্তুত হইয়া ডাকাডাকি করিতেছে, ঘরের মধ্যে একটি কথা নাই, চোখ ভরিয়া গৌর গাল দুটি বাহিয়া জল আসে, মুছাইয়া দিলে তখনই আবার ভরা-চোখ···অফুরন্ত, বাধা দিয়া ঠেকাইবার জো নাই।···সহসা হা-হা-হা করিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিয়া রায়রায়ান হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভরত রায়ের মেয়েটা দেখতে কেমন মধুকর?

মুখ লাল করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া মধুকর কোন প্রকারে জবাব দিল, ভাল।

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। ভাইয়ের গমন-পথের দিকে গভীর স্নেহে তাকাইয়া রায়রায়ান মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কিশোর বয়সের ইহাদের এই পাগলামি মিঠা লাগে। মধুকর চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ হাসি পাইতে লাগিল।

প্রাঙ্গণের কাছাকাছি একদিন মেয়েটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। সে একাকী দিক্‌প্রান্তে একাগ্র চোখে তাকাইয়া ছিল।

তুমি কে?

গম্ভীর কণ্ঠে মুখ ফিরাইয়া থতমত খাইয়া মেয়েটি বলিল, আমার নাম মঞ্জরী।

রায়রায়ান বলিলেন, তুমি তো ভরত রায়ের মেয়ে। শুনেছ বোধ হয়, তোমাদের গড়ের ভিতর অবধি ঘুরে এসেছি। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, রায় মশায়ের দেখা পাই নি। বলতে পার, তিনি কোথায়?

আত্ম-গৌরবে রামেশ্বর যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, চুপ করে চোখ নিচু করে রইলে যে বড়! জবাব দাও। গরজ আমারই। বীরবরের ঠিকানাটা পেলে তোমাদের বোঝা নামিয়ে অব্যাহতি পাই। ভয় নেই গো—আমরা কেউ যাচ্ছি না। খালি তোমাদের পালকি করে পাঠাব।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপে মঞ্জরীর চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিল। সুন্দরীর চোখের জল বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে রায়রায়ান উপভোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, রাগ কোরো না। ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, না হলে কোথায় আশ্রয় পেতে বল দিকি?

ভদ্রার জলে।

কুমারী মুখ তুলিল। অশ্রুভরা চোখ যেন জ্বলিতেছে। বলিতে লাগিল, ভদ্রার জলে আশ্রয় হত রায়রায়ান,—সে হত ভাল আশ্রয়। আগে তো বুঝতে পারি নি যে আপনি—

রামেশ্বর দীর্ঘকাল ধরিয়া হাসিতে লাগিলেন। ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, কিছুই বুঝতে পার নি? দেওড় শুনে কি ভাবলে বল তো? ভাবলে, শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘোড়া-পালকি নিয়ে মানুষ এসেছে, পটকা ছুঁড়ছে—না?

মঞ্জরী বলিল, ভেবেছিলাম—জোলো ডাকাত। ঘুণাক্ষরে আপনাকে সন্দেহ হয় নি। তারপর চোখ মুছিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল, রায়রায়ান আপনার সমস্ত খবর দেশের লোক জানে।

চিরকাল আপনাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে—ভেবেছেন কি! মিছামিছি এত জাঁক করে এই সব গড় করছেন। আপনার ঐ গড়খাইয়ের জলে ডুবে মরা উচিত—

মেয়েটির দুঃসাহসে রায়রায়ান স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তুচ্ছতম প্রতিপক্ষের সামনে হঠাৎ রাগ দেখাইবার ব্যক্তি তিনি নহেন। বরঞ্চ আঘাত যে যথাস্থানে গিয়া বাজিয়াছে, তাহাতে বড় আনন্দ হইল। সহাস্য নেত্রে তেমনি চাহিয়া বলিলেন, বটে!

মঞ্জরী বলিতে লাগিল, এই জায়গির কেমন করে আপনি নিয়ে এসেছেন, লোকে সমস্ত জানে। চাকলাদারেরা আপনাকে ঘৃণা করে, তারা কোনও দিন আপনাকে দলে নেবে না। তারা সব চাকলা গড়েছে গায়ের জোরে, আমির-ওমরাহের ঘরে মেয়েলোক ভেট পাঠিয়ে নয়।

ভাল, ভাল—বলিয়া মৃদু হাসিয়া নির্লিপ্তভাবে রামেশ্বর ফিরিয়া কয়েক পা গিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সুন্দরী, তোমাকেও তবে একটা সু-খবর দিয়ে যাই। আমির-ওমরাহ্‌দের ঘরে তুমিও যাবে, দুঃখ নেই, আমি কোন পক্ষপাত করি নে।

অবনতমুখী পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় মঞ্জরী শুনিতে লাগিল। রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন, সুখে থাকবে। বুঝলে? আগামী বুধবার যেতে হবে—প্রস্তুত থেকো।

কিন্তু ঐ মুখের কথাই। বুধবার তারপর দু-তিনটা কাটিয়া গেল, কিন্তু কোথায় বা রামেশ্বর, আর কোথায় তাঁহার সেই যাওয়ার আয়োজন!···মানুষ ও পশু পাশাপাশি খাটিয়া দিনের পর দিন নগর গড়িয়া তুলিতেছে। বড় বড় নৌকায় দেশ-বিদেশের কাঠ-পাথর আসিয়া জড় হইতেছে—সেই পাথর ভাঙার শব্দ, করাতে কাঠ চিরিবার শব্দ।···আজ কোথায় নূতন একটা স্তম্ভ উঠিতেছে,

এই কোন্‌দিকে কি একটা ধ্বসিয়া পড়িল, লোকজন কাতারে কাতারে ছুটিতেছে—তাড়া খাইয়া আবার উল্টা দিকে ছুটিতে লাগিল। ...দীর্ঘ দিন কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা হইয়া যায়, রাত্রির অন্ধকার গভীর হইতে গভীরতর হয়, তখন শত শত কামারশালায় জ্বলন্ত হাপরের পাশে হাতুড়ির ঘায়ে লোহার উপর আগুনের ফুলকি উড়িতে থাকে, হাতুড়ি বাজে ঠং-ঠং-ঠং—

দেওয়ান জীবনলালের উপর জায়গির ও গড় তৈরির সমস্ত ভার। তাঁর তিলার্ধ বিশ্রাম নেই। জায়গিরের বিধিব্যবস্থা তবু কতক কতক হইয়াছে, কিন্তু গড়ের কাজ কবে যে মিটিবে, সে এক বিশ্বকর্মা ছাড়া কেহ বলিতে পারে না। রাত্রে শুইয়া শুইয়া জীবনলালের মাথায় নূতন নূতন মতলব জাগে। পরিখা খোঁড়া হইয়াছে—তার ওদিকে উঠিবে আকাশভেদী প্রাচীর, চারিদিকে চারিটি সিংদরজা, দুর্গদ্বার হইতে চারিটি রাস্তা সোজা সিংদরজা ফুঁড়িয়া পরিখার সেতুর উপর পৌঁছিবে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া জীবনলাল মতলব খাড়া করেন; দিনের কাজকর্মের শেষে প্রসন্নচোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখেন, সুন্দর সুবৃহৎ রাজধানী আকাশের নীচে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।

নগরে ফিরিয়া ক'দিন অল্প কিছু বিশ্রাম লইয়া রায়রায়ানও এই-সব কাজের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছেন। খুব ভোরবেলা ঘড়াং করিয়া দরজা খুলিবার মুখে এক একদিন একটু-আধটু তাঁহার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বন্দিনীদের পাঠাইয়া দিবার তখনও কোন উপায় হয় নাই। মধুকর তাঁহাদের তদারক করে, সমস্ত দিন সে প্রায় এই-সব লইয়া থাকে। তারপর গভীর রাত্রে সকলে শুইয়া পড়িলে অনেকক্ষণ অবধি নির্জন অলিন্দে বসিয়া আপনার মনে বাঁশী বাজায়। সে সময়ে ঘুম-ভাঙা শয্যায় রামেশ্বরেরও এক একদিন মনে হয়, তাঁহার বড় যত্নে বড় কঠিন শ্রমে গড়া নগরীর

উপর মধুকরের বাঁশী নিষুপ্ত রাত্রে মাঠের দিগন্ত হইতে স্বপ্ন-কুহকিনীদের ডাকিয়া আনিতেছে।

একদিন নির্জনে রামেশ্বর হঠাৎ আসিয়া মঞ্জরীর সামনে দাঁড়াইলেন। শোন—

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে মঞ্জরী চাহিল। এক মুহূর্ত থামিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন, সেদিন আমার সম্বন্ধে তুমি মিথ্যা অভিযোগ করেছিলে। ও সব শত্রুদের রটনা।

এ কয়দিনে মঞ্জরী অনেক বুঝিয়াছে, চোখের জল একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। কৌতুক-চঞ্চল চোখ দু'টি নাচাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। বাধা দিয়া রামেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, বিশ্বাস করলে কি-না, বলে যাও—

মঞ্জরী কহিল, এ সাফাই-এর দরকার কি রায়রায়ান, আমি তো আপনার বিচারক নই—

রায়রায়ান বলিলেন, তুমি আমায় বিয়ে কর।

খিল-খিল করিয়া মঞ্জরী হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চাপিয়াছিল, আর পারিল না।

ক্রুদ্ধ হইয়া রামেশ্বর বলিলেন, তোমাকে আজই দিল্লি পাঠাতে পারি—জান? আর তার অর্থ কি, তা-ও বোধ হয় বোঝাতে হবে না।

পারেন তা? বলিয়া চোখে মুখে হাসির দীপ্তি তুলিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া প্রগল্‌ভা তরুণী চলিয়া গেল।

ইহার পর প্রায়ই দেখা হইতে লাগিল। দেখিলেই মঞ্জরী পলাইত। একদিন রামেশ্বর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তখনই ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, জোর করবার শক্তি আছে মঞ্জরী, কিন্তু মন তা চায় না। বলিতে বলিতে গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল, এ যেন সে লোক নয়—সজলকণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন, আমার জীবনের

খবর তুমি জান না···কিন্তু আর এই যুদ্ধবিগ্রহ ভাল লাগে না, এখন শান্তিতে একটুখানি মাথা গুঁজে থাকতে চাই।

মঞ্জরী শান্তভাবে শুনিতে লাগিলেন, পলাইবার চেষ্টা করিল না। রায়রায়ান বিশ বছরের কাহিনী বলিয়া চলিলেন। সমস্ত বলিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। ধীরে ধীরে মঞ্জরী চলিয়া গেল।

বিকালবেলা মঞ্জরী একখানা আয়না পাঠাইয়া দিল। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটু চিঠি—

তারপর যে বিশ বৎসর কেটে গেছে, রায়রায়ান। যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সম্ভবত আয়নায় চেহারা দেখবার ফুরসৎ হয় নি। তাই একটা আয়না পাঠিয়ে দিলাম·

চিঠি পড়িয়া রামেশ্বর অনেকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখে শুধু বলিলেন, আচ্ছা!

ভরতগড়ের রাণীর কানে পৌঁছিল, তাঁর দুরন্ত মেয়ে রায়রায়ানের সঙ্গে একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। এবারে রায়রায়ানের প্রতিহিংসা। ইহা যে কি বস্তু—রামেশ্বর অল্প দিন দেশে আসিয়াছেন, তবু চাকলাদারের ঘরের শিশুটি অবধি তাহা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। কিন্তু যাহাকে লইয়া এত বড় ব্যাপার, সে দিন-রাত দিব্য হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সেই চিঠি শতকুটি করিয়া ফেলিয়াও রায়রায়ানের রাগ মিটে না। তারপর এক সময়ে সত্যসত্যই তিনি আয়না দেখিতে বসিলেন। কুড়ি বছর ভাগ্যের সঙ্গে নিদারুণ লড়াই হইয়াছে, সর্বাঙ্গে তার প্রতিটি আঘাতের চিহ্ন। সমস্ত মাথার মধ্যে একটি কালো চুল নাই, মুখের উপর যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া নিজেরই প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া ওঠে, এ তরুণী ব্যঙ্গ করিবে ছাড়া আর কি? বিশ বছর আগে বেদনাবিদ্ধ যে যুবক গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহার

একবিন্দু চেহারা আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। সাদাচুলের রাশি ছুই হাতে ঢাকিয়া ধরিয়া আয়নার সম্মুখে বসিয়া রামেশ্বর সেই-সব দিনের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ সমস্ত রামনগর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পথে ছু-জন লোক একত্র হইলেই একটিমাত্র কথা। একজন সান্ত্রীকে হীরার আংটি বকশিস দিয়া ভরতগড়ের রাণী বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়া বুকের রক্তে ফুল রাঙাইয়া শ্মশানকালীর পূজার জন্য গোপনে পাঠাইয়া দিলেন। ভরত রায় অগ্রবর্তী, সঙ্গে আরও চারি জন চাকলাদার—সকলে মিলিয়া রামনগর ধ্বংস করিতে আসিতেছেন। সৈন্য আসিয়া ছুই ক্রোশের মধ্যে ঘাঁটি দিয়া বসিয়াছে।

অলিন্দে সেদিন আর মধুকরের বাঁশী বাজিতেছে না, সেইখানে গুপ্তমন্ত্রনা বসিয়াছে। মধুকর শত্রু-শিবির আক্রমণ করিতে চায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ উঠে নাই। মধুকর জেদ ধরিয়াছে—এই আঁধারে আঁধারে নিঃসাড়ে দলবল লইয়া শত্রুশিবিরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

রামেশ্বর মাথা নাড়িলেন! অসম্ভব, একেবারে অযৌক্তিক কথা। পাঁচ চাকলাদারের সমগ্র শক্তি সমবেত হইয়াছে, তার সামনে রায়-রায়ানের নব-নিযুক্ত ঢালির দল কয়টি বানের মুখে কুটার মতো ভাসিয়া চলিয়া যাইবে।

পদশব্দ।···কে? এতক্ষণে দেওয়ান জীবনলাল আসিয়া পৌছিয়াছেন। জীবনলাল দৌত্যে গিয়াছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর বলিতে লাগিলেন, দেবগঙ্গার চাকলাদার বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সকলের আগে ভরত রায়ের পুরমহিলাদের সসম্মানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাঁরা গিয়া যদি বলেন, কোন ছুর্ব্যবহার হয় নাই, সন্ধির বিবেচনা তারপর—

মধুকর লাফাইয়া উঠিল, কাজ নেই দাদা, ওঁদের পাঠানো হবে না। আমি সর্দারদের ডাকি।

কিন্তু ইহা কাজের কথা নয়। রামেশ্বর ভাইকে শান্ত করিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজি, গড়ের বাকি কত ?

জীবনলাল বলিল, শেষ হতে অন্তত আরও ছ-মাস। তখন পাঁচটা কেন পঞ্চাশটা চাকলাদার এলেও পিছু হটব না। কিন্তু এখন যা বলে মেনে নিতে হবে।

মধুকর গর্জিয়া উঠিল, এই অপমান ?

উপায় নেই। বলিয়া জীবনলাল ম্লান হাসিল। বলিল, চোখের সামনে এই-সব ভেঙে ছারখার করবে—আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না রায়রায়ান।

মধুকর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশ। কিন্তু হাঙ্গামার মধ্যে যাবার আগে গড়ের বন্দোবস্ত শেষ করে ফেলা উচিত ছিল না কি ? ওরা আসবে—এ তো জানা কথা।

এবার রামেশ্বর কথা কহিলেন। বলিলেন, জানা কথা কি বলছ মধুকর, এ স্বপ্নেও ভাবা যায় নি। চাকলাদারেরা চিরদিন নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি করে আসছে। আজকেই কেবল এক হল। এরা মতলব করেছে, সুবে বাংলায় আর নতুন জায়গিরদার ঢুকতে দেবে না।

জীবনলাল কহিল, আর ভরত রায়ও নানা মিথ্যে রটনা করেছে। স্ত্রী-কন্যা বেইজ্জত হয়েছে বলে সকলের কাছে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে।

মধুকর শেষ প্রস্তাব করিল, তবে আমরা পালাই। ভরতকে জব্দ করব। মেয়েদের নিয়ে ঢাকার দিকে চলে যাই।

জীবনলালের তাহাতেও মহা আপত্তি। বলিল, সে হয় না। তা হলে মানুষ না পেয়ে আক্রোশ পড়বে রামনগরের উপর। সমস্ত শ্মশান হয়ে যাবে। এবারে সন্ধি হোক। আমি কথা দিচ্ছি ছোট রায়, ছ-মাস পরে দশগুণ শোধ তুলব। আর অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক জল্পনার পর রামেশ্বর সকালবেলায় শিবিকার ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন।

চত্বরের প্রান্তে বহুপ্রাচীন শাখাবহুল সেই বকুলগাছ—ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া বাতাসকে গন্ধমন্থর করিতেছে। তাহারই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া রায়রায়ান নিঃশব্দে বিদায়-যাত্রা দেখিতেছিলেন। সবুজ কিংখাবে মোড়া হাঙর-মুখো মাঝের ঝালরদার শিবিকাখানি—ঐটি মঞ্জরীর। রামেশ্বর একাকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ নূপুরের শব্দে পিছনে তাকাইলেন। মঞ্জরী রূপে অলঙ্কারে বেশের পারিপাট্যে ঝলমল করিয়া আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

রায়রায়ানের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। ইহারা আজ বিজয়ী; তরুণীর মুখে-চোখে সেই অহঙ্কার যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। মৃদুস্বরে মঞ্জরী বলিল, যাচ্ছি—

রামেশ্বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল, আপনাদের যত্নে বড় সুখে ছিলাম। আপনাদের আতিথ্যের কথা বাবাকে বলব।

স্বরটা রায়রায়ানের কাছে ব্যঙ্গের মতো ঠেকিল। রূঢ় স্বরে জবাব দিলেন, বেশ, বোলো—একটা কথাও বাদ দিও না। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল। বলিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি—ডিঙায় করে তোমাদের ভদ্রার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দিই তলা ফুটো করে। ছটফট করে ডুবে মর। কিন্তু সে তো হবার জো নেই মধুকর আর জীবনলালের জ্বালায়—

সহসা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, হয়তো বুঝিবার ভুল হইয়াছে—মঞ্জরী দু'টি আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে। ঝর-ঝর করিয়া সেই অশ্রু গণ্ড বহিয়া ঝরিতে লাগিল। রামেশ্বর সেইদিকে চাহিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ম্লান হাসিয়া বলিলেন, তুমি গিয়ে স্বচ্ছন্দে সব কথা বলতে পার। এই-সব অট্টালিকা জায়গির স্বপ্নের মতো এসেছে—আবার যদি চলে যায়, আমার কিছু ক্ষতি হবে না।

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া রায়রায়ানের পদধূলি লইল। বলিল, আমি সমস্ত শুনেছি। এই রাজ্যপাট আপনার বীরত্বের ইনাম। ইচ্ছে হলে এর চতুর্গুণ এখনই আজকেই আবার আপনি তৈরি করতে পারেন।

রামেশ্বর ম্লান হাসিয়া মাথার পলিত কেশের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন, আর পারি নে। কুড়ি বছর পরে আয়নায় দেখলাম, সত্যিই বুড়ো হয়েছি। দেহে বল নেই, মনেও বল নেই। এখন এ-সব শেষ করে গরিবের ছেলে হয়ে আবার খোড়ো-ঘরে যেতে ইচ্ছে হয়। তোমায় আমি দিল্লি পাঠাচ্ছিলাম, আরও কত অত্যাচার হয়েছে হয়তো—আমার সমস্ত অপরাধ তোমার বাবাকে বোলো মঞ্জরী—

মঞ্জরী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, মিথ্যা বলব কেন?

রামেশ্বর অবাক হইয়া চাহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল, দিল্লিতে কখনও আপনি পাঠাতেন না, সে আমি জানি। আপনার মনের কথা সমস্ত জানি আমি। যাবার বেলায় তাই প্রণাম করতে এলাম।

বলিতে বলিতে সে থামিল। মুখের উপর এক ঝলক রক্ত নামিয়া আসিল। জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিতে লাগিল, বাবা এবার অনেক আয়োজন করে এসেছেন, আমি না গেলে অনর্থ হবে। আমি তাই ফিরে যাচ্ছি। আপনার রাজধানী গড় নাওয়ারা—সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে আমাকে নিয়ে আসবেন। তাই বলতে এলাম।

নিয়ে আসব? সম্মোহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রামেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, তুমি কি সত্যি কথা বলছ? আমি বুড়ো হয়ে গেছি, মন বড় দুর্বল মঞ্জরী—

মঞ্জরী রায়রায়ানের দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া

রহিল। অশক্ত বৃদ্ধ নয়—রণশ্রান্ত মহাবিজয়ী বীর তার সম্মুখে। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া অশ্রুভরা চোখে কুমারী হাসিল—ম্লান, কিন্তু বড় মধুর হাসি। বলিল, নিয়ে আসবেন। জন্মাষ্টমীর রাত্রে আমরা প্রতি বছর গড়ের বাইরে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যাই। সঙ্গে জন-পঞ্চাশ মাত্র রক্ষী থাকে। এখনও তার ছ-সাত মাস দেরি। আপনি এর মধ্যে গড় শেষ করুন। কুণ্ডলকে নিয়ে যাবেন। আমি ভদ্রার কূলে কৃষ্ণচূড়ার তলায় অপেক্ষা করব—আপনি আর আপনার কুণ্ডল আমাকে উদ্ধার করবেন।

ঝুনঝুন নূপুর বাজাইয়া মঞ্জরী ধীরে ধীরে শিবিকায় গিয়া বসিল।

গড়ের কাজে পরদিন হইতে চতুর্গুণ লোক লাগানো হইল। পুরীর সামান্য কর্মচারীটি পর্যন্ত বুঝিয়াছে, রায়রায়ান প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। জীবনলাল মহিলাদের পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল, ফিরিতে রাত হইল। তারপর গভীর রাত্রে আগের দিনের মতো আবার গুপ্ত পরামর্শ। চাকলাদারেরা সসৈন্যে ফিরিয়া যাইতে রাজি হইয়াছেন; কিন্তু ভূষণার মধ্যে রামেশ্বরকে এই নূতন গড় গড়িতে দেওয়া হইবে না।

জীবনলালের পরামর্শ, ইসলামাবাদের দিকে গিয়া ফিরিঙ্গিদের শরণ লওয়া। সেখানে জায়গিরের বিলিব্যবস্থা করিতে বেগ পাইতে হয় না। বাদশাহের নিকট হইতে নূতন ফর্মান আনিবার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু রামেশ্বর ঘাড় নাড়িলেন। আর তাঁহার নূতন করিয়া ভাগ্য খুঁজিবার উৎসাহ নাই।

একদিন রামেশ্বর কিল্লাবাড়িতে ফৌজদারের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। তারপর অনেকদিন ধরিয়া এই পরামর্শ চলিল। জীবনলাল ইতিমধ্যে ইসলামাবাদের দিকে চলিয়া গিয়াছে। গড়ের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ। অর্ধসমাপ্ত পরিখা ও নগর শ্মশানের মতো খাঁ-খাঁ করিতেছে।

পাকসির বিল ইদানীং মজিয়া গিয়াছে, চৈত্র-বৈশাখে প্রায়

শুকাইয়া আসে। তখন দিগন্তব্যাপ্ত নিবিড়কৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন জলধারা ক্রোশের পর ক্রোশ তরঙ্গিত হইত। বড় শুকনার সময়ে গোটা বিশ-পঁচিশ চর মাত্র সীমাহারা বারিসমুদ্রের মাঝখানে অসহায়ের মতো মাথা উঁচু করিয়া থাকিত। ৰিলের কিনারা দিয়া কিল্লাবাড়ি যাইবার পথ। মাসাবধি পরে কুণ্ডলের পিঠে চড়িয়া একদিন রামেশ্বর ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ফৌজদার শেষ পর্যন্ত কোন সুবিধাই করিতে পারিলেন না। ফিরিবার পথে বিলের প্রান্তে আসিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটি সঙ্কল্প হঠাৎ রামেশ্বরের মনে জাগিয়া উঠিল।

রামনগরবাসী এবং চাকলাদার মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল, পরাজিত অবমানিত রায়রায়ান মনোকষ্টে বিবাগী হইতে বসিয়াছেন, দিবা-রাত্রি অন্তঃপুরের মধ্যে শ্যামসুন্দরের উপাসনায় তিনি মাতিয়া থাকেন। তারপর অনেক দিন পরে একদিন কুণ্ডলের পিঠে রায়রায়ান বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহস্র প্রজা সমবেত হইয়াছে।

জীবনলালও সেইদিন ফিরিয়াছে। সে চুপি-চুপি বলিল, এ সবে কাজ নেই প্রভু, ইসলামাবাদ চলুন—

পর্টুগিজদের সঙ্গে শর্ত হইয়া গিয়াছে; ইসলামাবাদে রাজ্য-পত্তন করিতে আর গোল নাই। সেখান হইতে রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া একদিন ভূষণাকেও গ্রাস করিবে, জীবনলাল সেই স্বপ্নে মাতোয়ারা।

কিন্তু রামেশ্বর রাজি নহেন। নিরন্ন সর্বস্বহারা হইয়া পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছে, বিনিদ্র কত রাত্রি অজানা প্রান্তরের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে কাটিয়াছে, দিন মাস বৎসরগুলি দেহের উপর পদাঙ্ক আঁকিয়া দ্রুত পলাইয়া গিয়াছে। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া নূতন করিয়া তিনি আর সংগ্রামে মাতিবেন না। হাসিয়া বলিলেন, জীবনলাল, ইসলামাবাদে তুমি রাজ্য কর। আমি ফর্মান এনে দেব।

জীবনলাল জিভ কাটিয়া বলিল, প্রভু, আমার কাজ রাজ্য গড়া—রাজত্ব করা নয়।

তবে মধুকরকে নিয়ে যাও। সে দেশ অরাজক, মগ আর ফিরিঙ্গি ডাকাতদের মধ্যে আমি তিলার্ধ বিশ্রাম পাব না। আমি পাকসির বিলের মধ্যে দেউল গড়ে শেষ ক'টা দিন শান্তিতে থাকব।

কাছাকাছি পাঁচ-সাতটা সুদীর্ঘ চর, তাদের মাঝে অল্প অল্প জল-কাদা। কুণ্ডলের পিঠের বল্লম উঁচু করিয়া রায়রায়ান। প্রথম যৌবনের দুর্ধর্ষ বিক্রম বুকের মধ্যে আবার নাচিয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সামনের দিকে তাকাইয়া রায়রায়ান মাটিতে বল্লম ছুঁড়িয়া মারিলেন। অমনি সারবন্দি হাজার কোদাল পড়িল—ঝপ্ পাস্। সেই হাজার হাত হইল দীঘির উত্তরসীমা।

বল্লম তুলিয়া লইয়া রায়রায়ান তীরবেগে কুণ্ডলকে ছুটাইলেন। কুণ্ডল উড়িয়া চলিল। একদমে আধ ক্রোশ গিয়া একলহমা ঘোড়া থামিল। রায়রায়ান বল্লম পুঁতিয়া রাখিয়া রামনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

হাজার হাজার কোদাল দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। অবশেষে পোঁতা বল্লমের গোড়ায় আসিয়া দীঘি কাটা শেষ হইল। মাটির স্তূপে আকাশভেদী পাহাড় হইয়াছে। দেশ-দেশান্তর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই আসিয়া জমিতে লাগিল। দিনরাত্রি সেই পাথর মাটিতে বসানো হইতেছে, পাথরের উপর পাথর বসাইয়া দ্রুত এক অতি-বিচিত্র দেউল খচিত হইতেছে। কত স্তম্ভ, কত চূড়া, কত মনোহর কারুকার্য তাহার উপর! সমস্ত জীবনের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার উজাড় করিয়া রামেশ্বর পাকসির বিলের মধ্যে ঢালিতে লাগিলেন।

আকাশ আলো করে দাঁড়িয়েছে, চমৎকার! চমৎকার!

লোকে বলে, রায়রায়ানের সাধনপীঠ।

কোন্ দেবতার প্রতিষ্ঠা হবে?

কেহ বলিতে পারে না।

ক্ষান্তবর্ষণ মেঘান্ধকার ভাদ্র-অষ্টমীর সন্ধ্যাকালে রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। মঞ্জরী ভুলে নাই—মন্দিরের লৌহ-সম্বদ্ধ সুদৃঢ় বেষ্টনীর বাহিরে কৃষ্ণচূড়ার তলে আঁচল ঝাঁপিয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, মুহূর্তে ঘোড়ায় চড়িয়া রায়রায়ানের পৃষ্ঠ-লগ্ন হইল। রক্ষীরা সচকিত হইয়া দেখিল, দস্যু কন্যাকে লইয়া পলাইতেছে। কড়কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া মুষলধারে জল নামিল।

কুণ্ডল তীরবেগে ছুটিল। কুণ্ডলের কে অনুসরণ করিয়া পারিবে? দেখিতে দেখিতে ঘোড়া নিখোঁজ হইয়া গেল।

রামনগর যখন পৌঁছিল তখন শেষরাত্রি। পিঠের উত্তরীয় খুলিয়া রামেশ্বর কুমারীর দেহবল্লরী ধীরে ধীরে বাহুতে ধরিয়া তুলিলেন। পদ্মের পাপড়ির মতো চক্ষু দু'টি মুদিয়া মঞ্জরী ক্লান্তিতে এলাইয়া রহিয়াছে। মেঘভাঙা ক্ষীণ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে তার ঘুমন্ত মুখের উপর। গভীর স্নেহে মুহূর্তকাল রামেশ্বর সেই মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে তাহাকে সুকোমল উষ্ণ শয্যার উপর শোয়াইয়া দিলেন।

মধুকরের ডাক পড়িল। আনন্দের প্লাবন রামেশ্বরের অন্তর ভরিয়া ছাপাইয়া বাহিরে আসিতেছে, পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে ভাসিয়া গিয়াছে। রামেশ্বর বলিলেন, মঞ্জরী রইলেন। দিনের বেলায় নয়—কাল সন্ধ্যার পর আঁধারে আঁধারে বজরায় করে ওঁকে পৌঁছে দিও। আমি দেউলের দরজায় প্রতীক্ষা করব।

মধুকর বলিল, এখনই যাচ্ছেন কেন? আপনি বড় ক্লান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।

রামেশ্বর কহিলেন, অবসর কোথা ভাই? এখনও মন্দিরের চূড়ায়

সোনার কলসি বসানো হয় নি, কত কাজ বাকি! কাল দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে। এর মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে তো?

হাসিয়া তখনই তিনি রওনা হইয়া গেলেন।

দীঘির জল কাকচক্ষুর মতো টলমল করিতেছে; সকালের সোনার আলোয় দেউল জলের উপর ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিশ্বাস ফেলিয়া রায়রায়ান অসমাপ্ত কাজটুকু সমাধা করিতে লাগিয়া গেলেন। লোকজন আর বেশি নাই, অনেকেই বিদায় হইয়া গিয়াছে। দেউল-শীর্ষে সোনার কলসি বসানো হইল, সারচন্দনে সমস্ত প্রকোষ্ঠ অনুলিপ্ত করা হইল, সহস্র ঘৃতের দীপ সাজানো হইল—রাত্রে জ্বালা হইবে, ডিঙার পর ডিঙা ভরিয়া আসিতে লাগিল পাকসি বিলের সমস্ত পদ্মফুল।

এত ফুল?

রায়রায়ানের পূজায় লাগিবে।

রাত্রির দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। রায়রায়ানের গুপ্ত পূজা, সেজন্য সন্ধ্যার আগেই সমস্ত লোক দেউল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কেহ নাই। লোকালয় হইতে বহু দূরে প্রকাণ্ড বিলের নিঃশব্দ পাষাণপুরীর মাথায় অনন্ত তারকাশ্রেণী। কক্ষের দীপাবলি একের পর এক নিভিয়া আসিতেছে, হু-হু করিয়া নৈশ্য-বাতাসে বিলের জল ছল-ছল করিয়া উঠিতেছে। রামেশ্বর ছুটিয়া জলের প্রান্তে গিয়া দাঁড়ান, বুঝি বজরা আসিয়া ভিড়িল। আবার মেঘ জমিয়া তারা ঢাকিয়া অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিতেছে। সহসা রামেশ্বরের মনে হইল, মরিয়া প্রেত হইয়া তিনি যেন নির্জন দ্বীপভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—কণ্ঠে ধ্বনি নাই, পদতলে মৃত্তিকা নাই, অন্ধকার ছাড়া দৃষ্টি করিবার বস্তুও কিছু নাই, প্রবল প্রবাহশীল অনন্ত বায়ুমণ্ডলে তিনি হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। অন্তরাত্মা

সত্য সত্যই তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল, হা-হা-হা করিয়া অকস্মাৎ উদ্দাম হাসির সঙ্গে অমূলক ভয় ভাঙিতে চেষ্টা করিলেন। মনে হইল, দূরের মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া জলরাশি উত্তাল তাড়নে ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে কি যেন আগাইতেছে। দুই চক্ষের সমস্ত দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করিয়া অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া অধীর কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, মধুকর! মধুকর!

ফিরিয়া আসিয়া আবার দ্বারপ্রান্তে বসিলেন। দীপ নিবিয়া গিয়া অন্ধকারের মধ্যে বিশাল সৌধকক্ষ অপরূপ রহস্যাবৃত দেখাইতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। ঝড়ের বাতাস নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া নবনির্মিত দেউলের পাষাণ-প্রাচীরে আর্তক্রন্দন তুলিয়া দাপাদাপি করিতে লাগিল।...ক্রমে রামেশ্বর কোন সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ বৃষ্টি-সিক্ত শীতল হস্ত আসিয়া লাগিল বাহুর উপর। মুহূর্তে চমকিয়া জাগিয়া বলিলেন, এলি? চোখ মুছিয়া দেখিলেন, মধুকর নহে—জীবনলাল। জীবনলাল নমস্কার করিল। উঠিয়া বসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে রায়রায়ান বলিলেন, আবার ইসলামাবাদ গিয়েছিলে, না? কবে ফিরলে?

জীবনলাল বলিল, আজ। সেখানে সমস্ত ঠিক করে এসেছি। ছোটখাট গড়ের পত্তন হয়েছে।

একটু বিরক্তির সঙ্গে রায়রায়ান বলিলেন, সে কথা আমার সঙ্গে কেন দেওয়ানজি, ছোট রায়ের সঙ্গে বোলো।

জীবনলাল আবার নমস্কার করিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিল, তিনি চলে গেছেন সেখানে। আমি শুধু খবরটা দিতে এসেছি।

মঞ্জরী তা হলে তোমার সঙ্গে এলেন? ব্যস্ত হইয়া রামেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জীবনলাল বলিল, না প্রভু, তিনিও স্বামীর সঙ্গে গেছেন। ছোট রায় সেই খবর দিতে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

নিবিড় অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, দু-জনেই পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া। তারপর রায়রায়ান বসিলেন। হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, মধুকর কি বলে পাঠাল ?

তিনি বললেন, মঞ্জরী তাঁর বাগ্‌দত্তা বধূ—আট মাস আগে রামনগর প্রাসাদের অলিন্দে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষি করে গোপনে তাঁদের মালা-বদল হয়েছিল। ভরত রায়ের কঠোর শাসন থেকে তাঁকে ছিনিয়ে আনা—আপনি আর আপনার কুণ্ডল ছাড়া জগতে আর কারও সাধ্য হত না। কৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি আপনাকে প্রণাম পাঠিয়েছেন।

বেশ, বেশ! বলিয়া বিল কাঁপাইয়া রামেশ্বর আবার হাসিয়া উঠিলেন। আর রাণী মঞ্জরী—তিনি কিছু বললেন ?

জীবনলাল বলিল, রাণী বলে পাঠিয়েছেন, বাধ্য হয়েই তাঁকে আপনার সঙ্গে একটু ছলনা করতে হয়েছিল। আপনি তাঁকে ক্ষমা করবেন।

ভোর হইয়া গেলে জীবনলাল বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল, রামেশ্বর জলের দিকে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া আছেন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, জলে কেমন ছায়া পড়েছে দেখ। আমারও ছায়া পড়েছে—বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, না ?

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, পাগলের মতো।

জীবনলাল বলিল, প্রভু, বিদায় দিন এবার—ইসলামাবাদ যাব।

এখনই ?

হাঁ। নতুন রাজ্য গড়ছি, অবসর নেই। আশীর্বাদ করুন রায়রায়ান, এবার যেন সফল হই।

রামেশ্বর গভীর কণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন। তারপর বলিলেন,

আর একটা কাজ করে দিয়ে যাও দেওয়ান মশাই। যারা দেউল গড়তে এসেছিল, তারা রামনগরে এখনও পুরস্কারের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে। তাদের একবার এখানে পাঠিয়ে দিয়ে যাও—কাজ আরও বাকি আছে।

লোকজন আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল দেউল-চূড়ায় সোনার কলসি ঝকঝক করিতেছে, রামেশ্বর দেখাইয়া ইঙ্গিত করিলেন নামাইয়া আনিতে। কাল এমনি সময়ে কত কষ্টে কত কৌশলে কলসি ওখানে বসানো হইয়াছে, গাঁতি দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আবার তাহা খসাইয়া আনা হইল। কলসি উপুড় করিয়া তাহার উপর বসিয়া রামেশ্বর হুকুম দিলেন, ভাঙো দেউল।

রায়রায়ান প্রকৃতিস্থ নাই, সকলে বুঝিল। কেহ অগ্রসর হইল না। রামেশ্বর পুনরায় বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন। কয়েক জন রামনগরে ছুটিল খবর দিতে, কাল রাত্রে পূজা করিতে গিয়া রায়রায়ান একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। রামেশ্বর কলসি লইয়া ছুটিলেন কক্ষের মধ্যে। কুলুঙ্গির টানা খুলিয়া সঞ্চয়ের অবশেষ সমস্ত সুবর্ণ-মুদ্রা বোঝাই করিয়া কহিলেন, ভাঙো দেউল, ভাঙো দেউল, ভাঙো দেউল—। মুঠি মুঠি করিয়া স্বর্ণ-মুদ্রা সকলের কোলে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, স্বর্ণমুঠি ধূলিমুঠির মতো ছড়াইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, ভাঙো, ভাঙো—

তারপর নিজেই গাঁতি লইয়া উপরে উঠিলেন।

ঝুপ-ঝুপ শব্দে ইট-পাথর টুকরা টুকরা হইয়া পড়িতে লাগিল। মাসের পর মাস বাটালির আঘাতে পাষাণ খণ্ডগুলি জীবন্ত প্রতিমার রূপ ধরিয়াছিল। বৃদ্ধ রতনদাস শিল্পীদের সর্দার। নিজে সে গাঁতি ধরিতে পারিল না, প্রাঙ্গণের এক ধারে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছিল। উন্মাদ রামেশ্বর নামিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিলেন। দেখিয়া মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তাহার মুখের উপরে অতি সন্নিকটে মুখ

আনিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন, কাঁদছ কেন? চুল পেকেছে বলে? এস আমার সঙ্গে—

কেহ কিছু বুঝিবার আগেই বিশাল তরঙ্গায়িত ঘোড়াদীঘির তলহীন ঘনকৃষ্ণ জলরাশির মধ্যে রামেশ্বর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। হায়-হায়—করিয়া আকুল চিৎকার উঠিল। শত শত লোক তাঁহাকে ধরিতে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এখন যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনকাল নাই। সেকালের দুর্ধর্ষ চাকলাদারেরা মরিয়া গিয়াছে; সুস্থ স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বিগ্ন বাংলা দেশ। সেই অগ্নিবর্ষী তোপগুলিরও পরমাগতি লাভ হইয়াছে। কামারের আগুনে পুড়িয়া কতক হইয়াছে কয়েদির বেড়ি কিংবা রাস্তা তৈরির রোলার। কতকগুলি নদীর পলিমাটিতে একেবারেই লুকাইয়া গিয়াছে। গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে তবু কদাচিৎ ধূলামাটি-মাখা দু-একটার হঠাৎ দেখা পাইয়া যাইতে পার। হয়তো কোন অশ্বত্থতলায় বিলুপ্ত-বংশ প্রাচীন অতিকায় কঙ্কালের মতো রোদ-বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া আছে, মহাকাল পদাঘাতে ঠেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ইদানীং রাখালেরা গরু ছাড়িয়া দিয়া তাহার উপরে বসিয়া বাঁশী বাজায়। এমনি একটা কিল্লাবাড়ির ঘাটে পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সেইটা থাকায় ডোঙা বাঁধার বড় সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু সাবধান! ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখিয়া রাত্রে কোনদিন ঐ ঘাট হইতে ডোঙা খুলিয়া দিও না, সহস্র সহস্র ফুটন্ত শাপলা তোমাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিবে। লগি ঠেলিতে ঠেলিতে হঠাৎ এক সময়ে পাষাণ-স্তূপে ধাক্কা খাইবে, তাকাইয়া দেখিবে—একেবারে রায়রায়ানের দেউলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছ। নিষুপ্ত রাত্রে দ্বীপের উপর তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে তেরছা হইয়া পড়া জ্যোৎস্না

…হঠাৎ বাতাস উঠিয়া নলবন বাজিয়া উঠিবে। মনে হইবে, নির্জন ধ্বংসাবশেষ দেউলে রায়রায়ান হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। ত্রস্ত হইয়া যে-দিকে ডোঙা ঘুরাইবে, দেখিতে পাইবে সেকালের প্রস্তরীভূত অসংখ্য অপ্সরা ময়ূর ও পদ্মফুল। অল্প অল্প মাথা তুলিয়া তাহারা তাকাইয়া থাকিবে, আলেয়ার মতো পথ ভুলাইয়া সমস্ত রাত্রি তোমাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে—ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

আলেখ্য

সেই কোন্ সকালে পঞ্চানন চারিটি নাকেমুখে গুঁজিয়া জেলেদের লইয়া বাহির হইয়াছিল। পাশাপাশি দুইটা গ্রামের তিন-চারিটা পুকুরে সন্ধ্যা অবধি মোট আড়াই মনের উপর মাছ ধরা হইয়াছে। গ্রাম-সীমায় বিলের ধার দিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিতেছিল—আগে পঞ্চানন, পিছনে মাছের ঝুড়ি ও জাল লইয়া জেলেরা। জ্যোৎস্না রাত্রি।

হঠাৎ পেঁচা ডাকিয়া উঠিল।

রাখহরি জেলে অমনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, শুনতে পাচ্ছেন বাবু ?

পঞ্চানন তখন অন্যমনা, বাড়ির লোকদের নিদারুণ অত্যাচারের কথা ভাবিতেছে। এই মাছ ধরিবার কাজটা ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সারাদিন তাহাকে এমন ভাবে বাড়িছাড়া করিয়া রাখা তাঁহাদের কোনক্রমে উচিত হয় নাই—তা কাল বাড়িতে যত বড় ভারি ক্রিয়াকর্ম থাকুক না কেন। বিরক্ত হইয়া বলিল, চল্ চল্, তোরা দাঁড়াস নে—

কিন্তু পিছনে চাহিয়া দেখে, চলিবার লক্ষণ কাহারও নাই। এই বিলের মাঝখান দিয়া অনেককাল আগে বোধ করি কোন একটা রাস্তা ছিল; এখন আছে কেবল এখানে-ওখানে খানিকটা করিয়া উঁচু জমি। তাহাতে খেজুরগাছ, মাঝে মাঝে এক-আধটা বাঁশঝাড়। সেই দিক দিয়া ডাক আসিতেছিল।

রাখহরি সেই দিকে আঙুল তুলিয়া বলিতে লাগিল, উ-ই যেখানে পেঁচা ডাকছে—দেখুন একবার কাণ্ডটা বাবু, দেখছেন ? মিলে গেল না ?

পঞ্চানন কহিল, তোরা দেখ্‌ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আমি চললাম—

বলিয়া রাগে রাগে কয়েক পা আগাইয়া শুনিতে পাইল, উহারা বলাবলি করিতেছে—আ'লচোরা, আ'লচোরা! কৌতূহল বশে সে বিলের দিকে তাকাইল। তাই তো! উহাই হয়তো আলেয়া। দেখিল, যেদিক হইতে পেঁচার ডাক আসিতেছে তাহারই অনেকটা পূবে বিলের মাঝামাঝি পাঁচ-সাত জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে, আবার নিভিয়া নিভিয়া যাইতেছে।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বিলের কাছাকাছি বসতি, এই আ'লচোরার গল্প পঞ্চানন আশৈশব শুনিয়া আসিতেছে। আ'লচোরা একরকম অপদেবতা, ভূত-প্রেতের জ্ঞাতিগোষ্ঠি হইবে হয়তো, তাহাদেরই মতো মানুষের রক্তের উপর ঝোঁক কিছু বেশি। শিকারও বছরে জোটে নিতান্ত মন্দ নয়। আরও হয়তো বেশি জুটিত, কিন্তু আ'লচোরাদের মস্ত অসুবিধা এই যে কিছুতেই ডাঙায় উঠিয়া আসিতে পারে না। বিলের যে অংশ বড় নাবাল, কয়টা খাল ডালপালা মেলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং বারোমাসের মধ্যে কখনও জল শুকায় না, তাহারই নিকটবর্তী অঞ্চলে সারারাত্রি ইহারা শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। মুখের ভিতরে দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলে, যখন মুখ মেলে সেই আগুনের হল্কা বাহির হইয়া আসে, মুখ বন্ধ করিলে আগুন আর দেখা যায় না। যদি কোন পথিক তেপান্তরের বিলে রাত্রিবেলা একবার পথ হারাইয়া ফেলে আ'লচোরারা অমনি তাহা বুঝিতে পারে, দলে দলে নানাদিকে মুখ মেলিয়া আগুন জ্বালাইয়া পথহারাকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। পথিক মনে করে, বুঝি সেই দিকে গ্রাম, মানুষের বসতি—তা নহিলে আগুন জ্বলিতেছে কেন? আকুল হইয়া ছুটিয়া যায়। হঠাৎ সামনের আগুন নিভিয়া অন্ধকার হয়, পিছনে খানিক দূরে জ্বলিয়া উঠে আশায় আগ্রহে আবার সে সেইদিকে ছুটে। এমনি করিয়া নির্জন নিশীথে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, আর আ'লচোরারা

ভুলাইয়া ভুলাইয়া ক্রমশ তাহাকে জলার কাছাকাছি লইয়া ফেলে। তারপর ভয়ে ক্লান্তিতে অশক্ত হইয়া যদি একবার মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে—আর রক্ষা নাই—অমনি মুহূর্তে রক্ত-বুভুক্ষু অপযোনির দল চারিদিক হইতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার রক্ত শুষিতে আরম্ভ করে।

রাত্রিকালে বহুবিস্তৃত বিলের মাঝখানে, যেখানে কাঁদিয়া চেঁচাইয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিলেও মানুষের সাড়া মেলে না, কেবল সুবিপুল নিঃসঙ্গতা হিমশীতল বাতাসে মিলিয়া থমথম করিতে থাকে—হঠাৎ খানিক দূরে আলো দেখিলে বিপন্ন মানুষের সুদৃঢ় ধারণা হয়, উহা নিশ্চয় গ্রামের আলো। কোন্‌টা গ্রামের আলো আর কোন্‌টা যে জলাভূমির, নজর করিয়া তাহা চিনিবার উপায় নাই। কিন্তু চিনিবার একটা উপায় সর্বমঙ্গলা মহালক্ষ্মী সদয় হইয়া করিয়া দিয়াছেন। কোন্ কালে কি কারণে তুষ্ট হইয়া তিনি বর দিয়াছিলেন, সেই অবধি তাঁর বাহন পেঁচা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বিল পাহারা দেয়। আ'লচোরার পিছনে যদি কেহ ছুটে, অমনি নিশ্চয় তাহার মাথার উপর পেঁচা ডাকিয়া উঠিবে। তবে আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া সকলে এই সঙ্কেত ধরিতে পারে না।

এমন অনেক দিন হইয়া থাকে, নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, আশপাশের সমস্ত অঞ্চল নিষুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে হয়তো কোন গ্রাম-জননী হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া শুনিতে পান, বিলের দিক হইতে লক্ষ্মী-পেঁচার কর্কশ আওয়াজ আসিতেছে। কোন এক অপরিচিত দুর্ভাগ্য পথিকের বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠে। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া আকুল কণ্ঠে অনেকক্ষণ ডাকিতে থাকেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

ইহার পর চলিতে চলিতে আ'লচোরার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। পঞ্চানন তার কলেজে-পড়া বিদ্যা অনুসারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, এই আলেয়া এক রকম বাতাস, তাহাদের পেটে চোরাবুদ্ধি কিছু

নাই। কিন্তু অপর পক্ষ বিশ্বাস করিতেছিল না। এইবার বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে চুপ করিল, হঠাৎ মনে অন্য প্রকার আশঙ্কা জাগিতে লাগিল। এখন রাত্রি কত হইয়াছে, কে জানে! আবার আগের দিনের মতো কাণ্ড ঘটিয়া না বসে!

বাড়ি আসিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে আর তিলার্ধ দেরি করিল না, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিবার মতলবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময়ে বড়দাদা কানের কাছে ফিস-ফিস করিয়া বলিলেন, মাছগুলো নিয়ে এলে, এখন কোটা হচ্ছে—নজর রেখো, বুঝলে? যত পাজিলোক নিয়ে কারবার—

রাগে পঞ্চাননের ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে রাগ যে প্রকাশ করিবার নয়! বলিল, আমার বসবার জো নেই, মাথা ধরেছে—

সমস্ত দিন জেলেদের সঙ্গে রোদে-রোদে ঘুরিয়াছে, মাথাধরা বিচিত্র নয়। কাতর অবস্থা দেখিয়া বড়দাদা বলিলেন, তবে একটু দাঁড়াও, খেয়ে আসি দুটো—

বড়দাদার তামাকের অভ্যাস আছে। খাওয়া শেষ করিয়া এক ছিলিম সাজিয়া লইয়া অবশেষে ধীরে সুস্থে আসিয়া চৌকির উপর বসিলেন। তখন সে ছুটি পাইল।

ঘরের প্রবেশ-দরজায় দাঁড়াইয়া যে দৃশ্য পঞ্চানন দেখিল, আগের রাত্রিতেও ঠিক তাই দেখিয়াছিল। সুষমা শয্যার উপর যথারীতি নিস্পন্দভাবে লম্বমান। কুলুঙ্গির মধ্যে রেড়ির তেলের দীপটি মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে।

গত মঙ্গলবারে বিবাহ হইয়াছে, নববধূ আসিয়া পৌঁছিয়াছে মাত্র তিন দিন। ঠিক অন্যান্য বধূর মতো সুষমা নয়, লজ্জা-সরম যেন কিছু কম। কথাবার্তা কহিবার ফাঁক বড় বেশি এখনও মিলে নাই। সেই পরশু রাত্রে বেড়ার ধারে এখানে-ওখানে আড়ি-পাতা মেয়ে-

ছেলের কান বাঁচাইয়া সামান্য যা দু-চারিটি হইয়াছে—তাহারই মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে, কথা বলিতে গিয়া সুষমা ঘাড় নাড়িয়া একরকম অদ্ভুত ভঙ্গি করে, সে দেখিতে বড় মজা। কিন্তু কাল উহাকে যে কি ঘুমে ধরিয়াছিল, সারারাত্রির মধ্যে কিছুতে চোখ মেলিল না। আজও এই দশা।

খানিক এমনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারপর জোরে জোরে চটি-জুতার শব্দ করিয়া পঞ্চানন খাট অবধি গেল। শুইতে গিয়াও আবার শুইল না, হঠাৎ পাঠলিপ্সা বাড়িয়া উঠিল। মেডিকেল কলেজে থার্ড-ইয়ারে সে পড়ে। প্রদীপ উস্কাইয়া কুলুঙ্গি হইতে দেলকো-সুদ্ধ বিছানার পাশে রাখিল এবং মিনিটখানেক ধরিয়া মোটা একখানা ডাক্তারি বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

যেখানে সে প্রদীপ রাখিয়াছে, ঠিক তাহার পাশটিতে সুষমা চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গোড়ায় তাহার ভয়ঙ্কর রাগ হইয়াছিল, কিন্তু চাহিতে চাহিতে সেই রাগ গিয়া হঠাৎ অনুকম্পায় বুক ভরিয়া উঠিল। আহা, নিতান্ত অসহায়ের মতো করুণ মুখখানি উহার, কতটুকুই বা বয়স, ভিন্ন জায়গায় আসিয়াছে···চেনা জানা কাহাকেও দেখিতে পায় না, সারাদিন হয়তো মুখ শুকনা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজকর্মের ভিড়ে কেউ নজর রাখে না···এখন কেমন একেবারে বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে! সবুজ রঙের শাড়িখানি সুন্দর সুগৌর ছোট তনুটিকে বেষ্টন করিয়া আছে, সর্বাঙ্গে গহনার বাহুল্য প্রদীপের ক্ষীণালোকে ঝিকমিক করিতেছে, খোঁপা এলোমেলো হইয়া কয়েক গোছা চুল খাট হইতে মাটিতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অতি যত্নে চুলগুলি লইয়া, কি খেয়াল হইল—সুষমার মুখের দু-পাশ দিয়া পটুয়ার মতো যেন প্রতিমা সাজাইতে লাগিল।

আরও যে কি করিত বলা যায় না—কিন্তু এই সময়ে কেমন সন্দেহ হইল, সুষমা ঘুমায় নাই, চোখ মিটমিট করিয়া তাহাকে এক একবার

দেখিয়া লইতেছে। হঠাৎ ফিক করিয়া একটু হাসি। পঞ্চানন চুল ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া পুস্তকে মন দিল, আর ওদিকে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে সুষমা যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

গভীর মনোযোগের সহিত পঞ্চাননের অধ্যয়ন চলিয়াছে, দুষ্ট মেয়ে ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিভাইয়া আবার হাসিতে শুরু করিল। দক্ষিণের জানলা খোলা, ঘরময় জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িল। বই বন্ধ করিয়া পঞ্চানন কহিল, যাঃ পড়তে দিলে না—

সুষমা কহিল, ইস, তা বই কি! পড়াশুনো যা তোমার—সব দেখেছি, দেখেছি। তোমার বিদ্যে হবে না হাতী হবে—

পঞ্চানন যেন ভারি চিন্তিত হইয়া পড়িল। বলিল, হবে না? সর্বনাশ! তা হলে উপায়?

সুষমা কহিল, উপায় আর কি? মাছ ধরে খেও। বলিয়া সেই অপরূপ ভঙ্গিতে মুখ নাড়িয়া ছড়া আবৃত্তি করিতে লাগিল—

লিখিব পড়িব মরিব দুখে,
মৎস্য মারিব খাইব সুখে—

পঞ্চানন কহিল, তা হলে মাছ ধরে খাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই? ও সুষমা, আজকে মাছ ধরে এনেছি—এই এত বড় বড়—দেখেছ তো? ছাই দেখেছ, তুমি তখন নাক ডাকাচ্ছিলে তার—

বধূ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না—দেখি নি আবার! তুমি আসা মাত্তোর দেখে এসেছি। কতক্ষণ ধরে দেখেছি—ঠিক তোমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে। বল তো কোথায়?

পঞ্চানন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কোথায়?

বড় কাঁঠালগাছটার আড়ালে। তুমি যখন মাছ-কোটার সময় চৌকির উপর বসে ছিলে তখনও দাঁড়িয়ে আছি। কেউ দেখতে পেল না।

কি সর্বনাশ! যে বনজঙ্গল, স্বচ্ছন্দে সাপ-টাপ থাকিতে পারিত। লোকে দেখিলেই বা বলিত কি? পঞ্চানন কহিল, ছি ছি, নতুন বউ তুমি—তোমার কি এতটুকু বুদ্ধি-জ্ঞান নেই? ঐ রকম যায় কখনও?

সুষমা তাহার মুখের দিকে বড় বড় চোখ তুটি মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যেতে নেই?

নীরস কণ্ঠে পঞ্চানন কহিল, এ-ও শিখিয়ে দিতে হবে? এরই মধ্যে বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম্বর মধ্যে ঢি-ঢি পড়ে যাচ্ছে, সবাই বলছে বউ বেহায়া বেলাজ—

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। শাশুড়ির নিকট হইতে আজও এই কারণে বধূর গোপন তর্জন লাভ হইয়াছে। মুখখানি অত্যন্ত ম্লান করিয়া সুষমা নিচের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

পঞ্চানন বলিতে লাগিল, আর কক্ষনো কোন দিন অমন যেও না—বুঝলে? তোমার বাপের বাড়ির লোক সব কি রকম! কেউ বলেও দেয় নি?

সুষমা কি বলিতে গেল, কিন্তু অনেকক্ষণ বলিতে পারিল না। ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। শেষে কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, আর বোকো না। আমার মা নেই যে! বলিতে বলিতে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

এইটুকুতেই যে কেহ কাঁদিতে পারে, পঞ্চানন তাহা ভাবে নাই। ভারি অপ্রতিভ হইল। বাস্তবিক ইহার মা নাই যে! সংসারের কাণ্ডজ্ঞানহীন এক ফোঁটা অবোধ মেয়ে, আশৈশব বাপের আদরে মানুষ, কে-ই বা তাহাকে বুঝাইয়া-সমঝাইয়া শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবে? মা থাকিলে কি এমনটি হইতে পারিত? একা বাপ তাহার পক্ষে মা-বাপ তু-জন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, জীবনে এই সর্বপ্রথম সেই

বাপকে ছাড়িয়া পরের বাড়ি আসিয়াছে। যখন বর-কনে বিদায় হইয়া আসে, তাহার ঘণ্টাখানেক আগে বাপে-মেয়েয় এক থালায় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাত খাইতেছিল। হঠাৎ পঞ্চানন সেখানে গিয়া পড়ে। শ্বশুর তাহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সব পঞ্চাননের মনে পড়িতে লাগিল।

এই অবস্থায় কি যে করিবে, হঠাৎ বুঝিতে পারিল না। আবার আলো জ্বালিল। তারপর সস্নেহে দুই-তিনবার সে সুষমার চোখের জল মুছাইয়া দিল।

আস্তে আস্তে কহিল, আমি আর বকব না। সত্যি আর বকব না কোনদিন—

বলিয়া কোলের উপর বধূর মাথা টানিয়া লইল। সুষমার কান্না আর থামে না।

পঞ্চানন কহিতে লাগিল, বাপরে বাপ! এক কথা কখন কি বলেছি—বললাম তো, আর কোনদিন বলব না। বলিয়া ঘাড় নিচু করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ সুষমা, আমি বকেছি বলে এখনও কষ্ট হচ্ছে তোমার?

সুষমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে?

নীরবে সজল চক্ষু মেলিয়া সে স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

পঞ্চানন কহিল, বাবার জন্যে প্রাণ পুড়ছে—না?

অমনি পঞ্চাননের কোলের মধ্যে আবার মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চানন কহিল, এই সবে তিনটে দিন এসেছ—কালকে তোমার বউভাত, কত লোকজন আসবে, আমোদ-আহ্লাদ হবে—এ সব চুকে যাক, তারপর আমি নিজে রেখে আসব। অমন করে কাঁদে না। কই, চুপ কর। তবু?

সুষমা বলিতে লাগিল, না, আমি যাব—গিয়ে তক্ষুণি চলে আসব—একবার বাবাকে দেখেই অমনি চলে আসব। বাবা ঠিক মরে গেছে।

পঞ্চানন হাসিয়া উঠিল। বলিল, মরবেন কেন? বালাই ষাট! তোমার বাপের বাড়ি কি এখানে যে বললেই অমনি ফস করে যাওয়া যায়?

জানলার ওধারে একখানা উলুর জমি ছাড়াইলেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত বিল। সেইদিকে আঙুল তুলিয়া সুষমা কহিল, কেন, ওই তো ঐ বিলের ওপার। আমি বুঝি জানি নে? আসবার সময় পালকিতে বসে সমস্ত পথ দেখে এসেছি।

পঞ্চানন কহিল, বিলটাই হবে যে পাঁচ-ছ কোশ—অত বড় বিল এ জেলায় আর নেই।

অবুঝ বধূ তবু জেদ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, না, ও তোমার মিছে কথা। আমি যাব, যাব—তোমার দু'খানি পায়ে পড়ি। বলিয়া সত্য সত্যই পা ধরিতে যায়।

পা সরাইয়া লইয়া গম্ভীরভাবে পঞ্চানন কহিল, পাগল না কি? লোকে বলবে কি? শোও, ভাল হয়ে শোও—এমন তো দেখি নি কখনো—

ধমক খাইয়া শিষ্ট শান্ত হইয়া সুষমা শুইয়া পড়িল। একেবারে চুপচাপ। দেয়ালের ঘড়ি টকটক করিয়া চলিতেছে।

পঞ্চানন তাকাইয়া দেখিল। চালের গায়ে আড়ার ফাঁকে গোলাকার হইয়া প্রদীপের আলো পড়িয়াছে, ঘনপল্লব চোখ দু'টি একদৃষ্টে সেইদিকে মেলিয়া সুষমা চুপ করিয়া শুইয়া আছে। এ রকম মৌনতা বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। রাগ করিয়া কহিল, ওঠ, চল—এক্ষুণি রেখে আসি—

সুষমা কহিল, যাবে?

হুঁ—

অমনি তড়াক করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কই, তুমি ওঠ—

এমনি নিরীহ বোকা যে আর একজন রাগ করিয়াছে, তাহাও বুঝিবার বুদ্ধি নাই। সুষমা বলিল, চল না—

পঞ্চাননের রাগ থাকিল না, হাসিয়া ফেলিল। কহিল, এখন ঘুম পাচ্ছে, কাল সকালে যাব।

সুষমা কাঁদোকাঁদো হইয়া কহিল, এই যে বললে এক্ষুণি যাবে—

পঞ্চানন কহিল, আচ্ছা, তুমি কাপড়চোপড় পরে নাও, বাক্স-পেঁটরা গোছাও। আমি ততক্ষণ এক ঘুম ঘুমিয়ে নি।

এবার তাহার সন্দেহ হইল। বলিল, মিছে কথা, তুমি যাবে না—

পঞ্চানন কহিল, ঘুম পাচ্ছে, এখন যাব না—কাল সকালে নিয়ে যাব। দেখেছ তো কত খেটেছি! দুপুরের রোদ্দুর গিয়েছে মাথার উপর দিয়ে। এমন মাথা ধরেছে, উঃ! বলিয়া সে চোখ বুজিল।

একটু পরে পঞ্চানন চোখ বুজিয়াই অনুভব করিতে লাগিল, ঝিন-মিন করিয়া গহনা বাজাইয়া সুষমা পাশে আসিয়া বসিয়াছে। তারপর তাহার অত্যন্ত কোমল কচি আঙুল ক'টি দিয়া সে তাহার কপালের দুই পাশ টিপিয়া দিতে লাগিল। চুপ করিয়া খানিকক্ষণ পঞ্চানন উপভোগ করিল। শেষে চোখ মেলিয়া কহিল, আর না, থাক এখন—

আর একটু দিই।

কই, কাপড়চোপড় পরা হল তোমার? এখন যাবে না?

সুষমা কহিল, না, কালকে যাব। এখন তোমার কষ্ট হচ্ছে যে—

সেদিন পঞ্চানন ঘুমাইয়া পড়িলেও কত রাত্রি অবধি সুষমা

জাগিয়া বসিয়া রহিল। চুপি-চুপি জানালার ধারে গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল। উলুক্ষেতের এক দিকে একটি শীর্ণ নারিকেলগাছ, গোড়ায় রাখাল-ছিটার ঝোপ, তার উপরে তেলাকুচা ও বন-পুঁয়ের লতা দীর্ঘ গাছটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া অনেক দূর অবধি উঠিয়াছে। সুমুখ-জ্যোৎস্না রাত্রি। ক্রমে চাঁদ ডুবিয়া আস্তে আস্তে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। আকাশের তারা উজ্জ্বলতর হইল এবং সুষমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রায়ান্ধকার বিল সুবিপুল দেহ এলাইয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। বিলের ঐ ওপারে লাল-ভেরেণ্ডায় ঘেরা উঠান ছাড়াইয়া গোল-সিঁড়ি ছাড়াইয়া চিলে-কুঠুরির পাশে দোতলার ঘরটিতে তার বাবা এতক্ষণ কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন!···

ভোর হইতে না হইতে কাজের বাড়িতে হৈ-চৈ ডাকহাঁকের অন্ত নাই। পঞ্চাননের ঘুম ভাঙিবার অনেক আগে সুষমা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। নানা কাজে অনেক বার পঞ্চাননকে বাড়ির মধ্যে যাওয়া-আসা করিতে হইল, একবার গোয়ালাদের দইয়ের হাঁড়ি রাখিবার জায়গা দেখাইয়া দিতে, একবার ঘি বাহির করিয়া দিতে, আর একবার কে-একজন বুঝি পান চাহিয়াছিল—পান লইবার জন্য নিজেই সে সকলের আগে ছুটাছুটি করিয়া আসিল। আসিয়া এঘর-ওঘর পান খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, ভাঁড়ার-ঘরের পাশে ছোট কামরাটিতে সুষমা আপনার মনে বসিয়া সন্দেশ পাকাইতেছে। ছোট্ট ছোট্ট দু'টি হাত—চুড়ি ঝুন-ঝুন করিতেছে···শাড়ির খানিকটা মেঝের ধূলায় মাখামাখি, সেদিকে নজরই নাই।

ঠিক পিছনটিতে গিয়া পঞ্চানন চুপি-চুপি বলিল, আমায় একটা দাও না—

সুষমা প্রথমটা চমকাইয়া উঠিল। তারপর বলিল, না, ভোজের আগ ভেঙে অমন—

কিন্তু কে কার কথা শোনে! পঞ্চানন খপ করিয়া গোটা-দুই সন্দেশ তুলিয়া লইয়াই দৌড়।

সুষমা চেঁচাইয়া উঠিল, বলে দেব, দিয়ে যাও—ও দিদি, দিদি গো, সব চুরি হয়ে গেল—

পঞ্চানন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চেঁচাচ্ছ? নতুন বউ না তুমি?

এই সময়ে বড় বউদিদিও কোথা হইতে আসিয়া হাজির। বলিলেন, কি রে ছোট বউ, কি হল? ছোট বউ ততক্ষণে সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া লজ্জাবতী হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চানন নিতান্ত ভাল মানুষের মতো মুখ করিয়া কহিল, ও একলা বসে সন্দেশ পাকাচ্ছিল আর খাচ্ছিল বউদি, আমি এসে তাই দেখলাম।

বড় বধূ মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, তা থাক। ওর পেছনে তোমার লাগতে হবে না, নিজের কাজে যাও দিকি—

পঞ্চানন বলিল, বিশ্বাস করলে না? এখনও গাল বোঝাই, তাই কথা বলতে পারছে না।

বড়বধূ কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিলেন, যাও তুমি এখান থেকে বলছি। বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

ওর বউভাতের নেমন্তন্ন, ও মোটে খাবে না বুঝি? সেই কোন্ সক্কাল থেকে লক্ষ্মীর মতো আমার কত কাজ করে দিচ্ছে! তুমি কাজ কর দিদি, ওর কথা শুনো না—

ঘোমটার মধ্যে সুষমার তখন ভারি মুশকিল। দিদি হয়তো সত্য সত্যই তাহাকে সন্দেশ-চোর বলিয়া ভাবিবেন, কিন্তু আসল চোর যে কে তাহা ঐ সাধু মানুষটির হাতের মুঠা খুলিলেই ধরা পড়িবে। একথা জানাইয়া দিবার নিতান্ত দরকার যে গাল তাহার বোঝাই নয়, সে কথা কহিতে পারিতেছে না—নতুন বউ হইয়া বরের সামনে কথা সে বলে কি করিয়া?

বাহিরে পান পৌঁছাইয়া পঞ্চানন আবার ফিরিয়া আসিল। এবার সুষমা সাবধান হইয়াছে। পায়ের শব্দ পাইয়া সমস্ত সন্দেশ হাঁড়িতে তুলিয়া ফেলিল।

পঞ্চানন কহিল, শোন—

কাপড়ের নিচে হাঁড়িটি অতি সাবধানে ঢাকিয়া সুষমা মুখ তুলিয়া চাহিল।

সকালবেলা সেই যে তোমায় বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার কথা ছিল, যাও তো চল—

সুষমা বিরক্ত হইয়া কহিল, দেখছ না, কাজ করছি—

এ কাজ হয়ে গেলে?

তারপর কিসমিস বাছতে হবে, দিদি বলে দিয়েছেন।

তার পরে?

সুষমা গিন্নিমানুষের মতো পরম গম্ভীরভাবে কহিল, তার পরে? তোমার মোটে বুদ্ধি নেই। কাজকর্মের বাড়ি, কত লোকজন আসবে, খাওয়া-দাওয়া হবে—আমার কি আজ মরবার ফাঁক আছে?

বলিবার ধরন দেখিয়া পঞ্চাননের বড় কৌতুক লাগিতেছিল। বলিল, তা হলে বল যে মোটেই বাপের বাড়ি যাবে না। আমার দোষ নেই তবে—

এবার সুষমা সহসা কোন জবাব দিল না, ভাবিতে লাগিল। তারপর বলিল, এখন কাজ ফেলে কেমন করে যাই বল তো? রাত্তিরে যাব, ঠিক যাব—

তখন কিন্তু আমার ঘুম পাবে

না—বলিয়া সুষমা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া সকরুণ মিনতির স্বরে কহিল, রাত্তির হলে আমার বড্ড মন কেমন করে, সত্যি বলছি—তুমি আমায় নিয়ে যেও—

বোকা বধূ টের পায় নাই, কথাবার্তার মধ্যে কখন হাঁড়ির ঢাকনি সরিয়া গিয়াছে। পঞ্চানন সুযোগ বুঝিয়া ছোঁ মারিয়া আবার একটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া ছুটিল। এই করিতে সে আসিয়াছিল। দরজার কাছে গিয়া বলিল, বড় যে সাবধান তুমি—কেমন?

কিন্তু সুষমা একেবারে অপরাধ আমলে আনিল না, আগের কথাই পুনরাবৃত্তি করিল, ওগো, যাবে তো নিয়ে?

পঞ্চানন কহিল, তোমার দাদাকে বলে দেখো, তিনি তো আসবেন আজ নেমন্তন্নে। আমার ঘুম পায়।

বিকালবেলা সুষমা চুল বাঁধিয়া কপালে টিপ আঁকিয়া মহাআড়ম্বরে আলতা পরিতে বসিয়াছে, এমন সময়ে নির্মল আসিয়া সরাসরি বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। আলতা ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে সে বলিতে লাগিল, এসেছ দাদামণি? দেখ দিকি আমি কত ভেবে মরি—বেলা যায়, তবু আসা হয় না। বাবা এসেছেন?

বলিতে বলিতে আগাইয়া আসিয়া দেখে পঞ্চানন তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সুষমা পিছাইয়া গেল।

পঞ্চানন বলিল, আমি কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসুবিধে ঘটাই, আমি চললাম।

বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, আবার ফিরিয়া কহিল, আর সে কথাটারও একটা বোঝাপড়া যেন হয়ে যায় ভাই, সন্ধ্যে হলেই তোমার বোনটি বাপের বাড়ির বায়না ধরেন—সারারাত কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলান—আমায় ঘুমতে দেন না—

সুষমার মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে নির্মল জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি রে? অ খুকি, সত্যি?

সুষমা চাহিয়া দেখিল, পঞ্চানন চলিয়া গিয়াছে। ঘাড় নাড়িয়া

মহা প্রতিবাদ করিতে লাগিল, না দাদা, সব মিছে কথা। অমন মিথ্যুক তুমি মোটে দেখ নি। আজকে অমনি সন্দেশ নিয়ে—

বলিতে বলিতে কথার মাঝখানে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা এসেছেন?

নির্মল কহিল, বাবা আসবেন কি করে? মেয়ের বাড়িতে এলে আর-জন্মে কি হয় তা শুনিস নি?

সুষমা দুই হাতে নির্মলের বাহু জড়াইয়া কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিল, বাবা কি মরে গেছেন? ও দাদামণি, সত্যি কথা বল—আমি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

নির্মল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

খুকি, কি পাগল তুই এই ক'দিন দেখিস নি অমনি বুঝি মরে গেল? তা হলে আমায় কি এই রকম দেখতিস?

তখন সুষমা ভয়ানক জেদ ধরিল, ওরা কেউ আমায় নিয়ে যাবে না দাদা, মিছে কথা বলে ফাঁকি দেয়। আমি আজ তোমার সঙ্গে চলে যাব। আজই।

হাসিতে হাসিতে নির্মল কহিল, আজই?

হ্যাঁ—

পালকি-টালকি করতে হবে না?

সুষমা বলিল, পালকি কি হবে? ভারি তো পথ, এক ছুটে যাওয়া যায়। ঐ তো বিলের ও-পার—ঐ গাছপালাগুলো যেখানে। আমি তোমার পিছু-পিছু চলে যাব। রাত্তিরে যাবার সময় আমায় ডেকো। ডেকো—ডেকো কিন্তু। ডাকবে তো?

নির্মল কহিল, আচ্ছা—

দাদা যে এত সহজে রাজী হইয়া গেল, তার উপর হাসি মুখ—সুষমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া অবিশ্বাসের সুরে বলিতে লাগিল, হুঁ—বুঝেছি তোমার চালাকি। আমায় না বলে তুমি অমনি রাত্তিরবেলা···সে হবে না, কিছুতে হবে না—

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার একরকম চুকিয়া গেল, কয়েকজন মাত্র বাহিরের লোক বাকি ছিল, তাহারাও এইবার বসিয়া গিয়াছে। নির্মল নূতন দাবাখেলা শিখিয়াছে, পঞ্চাননকে কহিল, আর কি, এইবার একহাত হোক, তুমি ছকটা নিয়ে এস—

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। খোড়োঘরগুলির ছায়া দীর্ঘতর হইয়া উঠান অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু নির্মল শুনিল না, একরকম জোর করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল।

ছক ও বোড়ে লইয়া যাইবার মুখে পঞ্চানন দুষ্টামি করিয়া ঘুমন্ত মানুষের নাক ধরিয়া নাড়া দিল। ধড়মড় করিয়া সুষমা উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞসা করিল, দাদা ? দাদামণি চলে গেছে না কি ?

পঞ্চানন জবাব দিল না, সকৌতুক স্নেহে চাহিয়া রহিল।

সুষমা ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, কখন—কতক্ষণ বেরিয়েছেন ?

পঞ্চানন বলিল, তুমি যেমন ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আর ঘুমুবে ? আচ্ছা, আমি আসছি এখনি—শোও—

বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সুষমা শুইল না। ঘুমচোখে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দক্ষিণের দরজা খুলিয়া ফেলিল। সামনেই উলুক্ষেতের সীমান্ত দিয়া বৈশাখ মাসের শস্যহীন শুষ্ক শূন্য বিল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় ঝকমক করিতেছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে উঁচু টিলা, তার উপর দীর্ঘাকার পত্রঘন দুই চারিটা গাছ। চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া সেই জ্যোৎস্নার আলোকে সুষমা দেখিল—স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কিছুদূরে যে বড় টিলাটা তাহারই ছায়ায় ছায়ায় কে-একজন ধীরে ধীরে যেন ক্রমশ দূরে চলিয়া যাইতেছে, সাদা কাপড়ের উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। ঘর হইতে

এক দৌড়ে ছুটিয়া উলুক্ষেত ছাড়াইয়া বিল-কিনারায় দাঁড়াইয়া সে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। মুক্ত বাতাসে আঁচল উড়িতে লাগিল। সে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল, না, এখন কেহ চলিতেছে না, কিন্তু ঐ যে—নিশ্চয় সেই মানুষটাই খেজর-গুঁড়ির আড়ালে বসিয়া তাহাকে দেখিতেছে, তাহাকে দেখিয়াই ঠিক ঐখানে অমনি বসিয়া পড়িয়াছে।

দাদামণি গো—বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বিল ভাঙিয়া সে ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে ছায়াচ্ছন্ন টিলার উপর গিয়া উঠিল। কেহ কোথাও নাই, গাছের ফাঁকে একটুখানি জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, গাছ দুলিতেছে, ছায়া কাঁপিতেছে। তবু বিশ্বাস হইল না, বার-বার এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, সে ভুল জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে, এ সে জায়গা নয়, আরও ডাইনে···ঐ···ঐ ···এখনও ঠিক তেমনি বসিয়া আছে। সারি সারি পাঁচ-সাতটা কূয়া, পাড়ের উপর শোলার ঝোপ, ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে। ও দাদা, ও দাদা গো, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ঝোপ-জঙ্গলের পাশ দিয়া নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যযামে বিলের ভিতর দিয়া সে চলিল।

পিছনে গ্রামান্তরালে আস্তে আস্তে চাঁদ ডুবিল, দূরে কোথায় শিয়াল ডাকিতে লাগিল, চারিদিক অস্পষ্ট হইয়া আসিল। হঠাৎ সুষমার সর্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল, মাথার উপর দিয়া শোঁ-শোঁ করিয়া এক ঝাঁক কালো কালো পাখী উড়িয়া যাইতেছে। আর না আগাইয়া সে ফিরিয়া যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু পথ-রেখা নাই। ধানক্ষেতের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, সেখানে যাতায়াতের পথ পড়ে নাই, কোন্ দিকে গ্রাম—আবছা অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাইতেছিল না।

পিছন ফিরিয়া কেবল দাদা—দাদা—বলিয়া গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

হঠাৎ দেখিতে পাইল—আলো জ্বলিতেছে, কাহারা যেন লণ্ঠন জ্বালিয়া এই দিকে আসিতেছে, এক, দুই, তিন, চার···অনেকগুলি। অনেকগুলি আলো সারি বাঁধিয়া নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ভয়ে সুষমার কণ্ঠরোধ হইল। সমস্ত নিরীক্ষণ-শক্তি দুই চক্ষে পুঞ্জিত করিয়া অন্ধকারের মধ্যে সে দেখিতে লাগিল। বোধ হইল, ঐ আলোকের প্রতিটির পিছনে এক একটি সুবিপুল নিকষ-কৃষ্ণ দেহ রহিয়াছে, সারবন্দি আলেয়ারা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া গুটি-গুটি চলিয়া আসিতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণের আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া সুষমা দৌড়াইতে লাগিল।

চাষ আরম্ভের আর দেরি নাই, ক্ষেত সাফ করিতে চাষারা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার মুখে ধানের শুকনা গোড়ায় আগুন ধরাইয়া দিয়া যায়। ছুটিতে ছুটিতে সেই পোয়াল-পোড়া ছাই উড়িয়া সুষমার মুখে-চোখে পড়িতে লাগিল। একটা ক্ষেতে তখনও ভাল করিয়া আগুন নিভে নাই। এক ঝাপটা বাতাস আসিল, আর অমনি এক সঙ্গে বিশ-পঞ্চাশ জায়গায় দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পিছনে তাকাইয়া দেখে, সেদিকের আলোগুলি এখনও পিছন ছাড়ে নাই। ধরিয়া ফেলিল আর কি! চোখ বুজিয়া সে সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনুভব করিতে লাগিল, তাহাকে ঘিরিয়া ডাহিনে বামে সম্মুখে পিছনে সংখ্যাতীত আগুনের গোলা লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে। সেইখানে সে লুটাইয়া পড়িল।

বিলুপ্তাবশেষ চেতনার মধ্যে সুষমা শুনিতে লাগিল, অনেক দূরের এক একটা ডাক—খুকি···খুকি···কাহারা যেন কথা কহিতেছে··· অনেকগুলি লোক···চিৎকার, কোলাহল, ব্যস্ততা। সে চোখ মেলিতে পারিল না, সাড়া দিতে পারিল না। কিন্তু চোখ না মেলিয়া দেখিতে লাগিল, বড় বড় কালো মেটের মতো আলেয়ার দল মুখ মেলিয়া দ্রুতবেগে গড়াইয়া গড়াইয়া আসিতেছে, আগুন লাগিয়া সমস্ত বিল

জ্বলিতেছে। সেই আলোকে অস্পষ্ট যেন দেখা যাইতে লাগিল, বিলপারের লাল-ভেরেণ্ডার বেড়া, গোল-সিঁড়ির একটুখানি, চিলেকোঠা···

যাও পাখী বলো তারে

অন্ধকারে চোখের সামনে টাকার অঙ্কগুলা যেন কিলি-বিলি করিয়া বেড়াইতেছে!

অতুল আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া আলো জ্বালিয়া এই পঞ্চম বার দোকানের পাতড়া-বহি যোগ দিতে বসিল। দু-এক পাতা উল্টাইয়া সহসা মনে পড়িল, তোরঙ্গের মধ্যেও তো খানকয়েক রসিদ আছে—সেগুলা দেখা হয় নাই, উহার মধ্যে ঐ একাশি টাকার হিসাব থাকিতে পারে। উৎকণ্ঠাভরে তাড়াতাড়ি তোরঙ্গ খুলিয়া সমস্ত জিনিস, টুকিটাকি কাগজ-পত্র উপুড় করিয়া মেজেয় ঢালিল। পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিল তবু হিসাব মিলিল না। হিসাব ভাবিয়া আগ্রহে যাহা তুলিয়া লইল, সেটা অনেক পুরানো একখানা চিঠি—নির্মলার লেখা। খুলিয়া দেখে, চিঠিখানি সচিত্র—এক সুন্দরী গোলাপ ফুলের গাছে চড়িয়া আকাশমুখো তাকাইয়া আছেন, আকাশে একটি উড়ন্ত পাখি, পাখির পাখনার নীচে দিয়া দুই লাইন ছাপা কবিতা, সুন্দরীই পদ্যাকারে সেই কথাগুলি কহিতেছেন—

যাও পাখী, বোলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে—

বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত দিয়া অতুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। শেষে দোকানের দরজা খুলিয়া গাঙের ঠাণ্ডা হাওয়ায় পায়চারি করিতে লাগিল।

হাট অনেকক্ষণ ভাঙিয়া গিয়াছে। গভীর রাত। গাঙে এইবার জোয়ার লাগিবে, এই প্রতীক্ষায় ব্যাপারিরা চালার নীচে অন্ধকারে গল্পগুজব করিতেছে, কেহ-বা ওখানেই পড়িয়া ঘুমাইতেছে। ময়রাদের

দোকানে গান ও গুপীযন্ত্রের বাজনার আর তেমন জোর নাই, এইবার থামিবে বোধ হয়।

পাতড়া-খাতায় গরমিল দেখিয়া শ্বশুর যে কথা কয়টি বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত শান্ত এবং সংক্ষিপ্ত। অন্ধকারে পায়চারি করিতে করিতে উহা ভাবিতে গিয়া অতুলের চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিল। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ইহাই তো হইল যে ঘর-আলো-করা ছেলে হইয়াছে, তোমরা মেয়ে-জামাই এখন আবর্জনার সামিল। মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, আর নয়, আর নয়—অনেক হইয়াছে। এ আশ্রয়ে আর একদিন—একদণ্ড থাকা চলিবে না, এই হাটুরে-নৌকাতেই বিদায় হইয়া যাইতে হইবে।

ঘরে আসিয়া লম্বা চিঠি লিখিয়া ফেলিল—

আমি চলিলাম, আপনার টাকা চুরি করি নাই, আপনার দোকানের জন্য কি রকম প্রাণপাত করিয়াছি তাহা ভাবিয়া দেখিবেন, আপনার অন্ন গলা দিয়া ঢুকিবে না—এমনি ধরনের কত কি লিখিতে লিখিতে বালির কাগজের এক ফর্দ ভরিয়া গেল। চিঠিখানা হাতবাক্সের উপর দোয়াত-চাপা দিয়া রাখিয়া তোরঙ্গটি এবং কাপড়-জামা-চাদর পুঁটুলি করিয়া লইল। তারপর বদন ব্যাপারির নৌকায় জিনিসপত্র রাখিয়া আসিয়া ডাকিল, ও মধু!

অনেক ডাকাডাকিতে মধুসূদন চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিল। অতুল কহিল, একবার দুয়োরটা বন্ধ করে দে, মাণিক—

মধুসূদনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এখন চললেন গানের আড্ডায়? রাত তা হলে আজ কাবার হবে একেবারে। ধন্যি আপনি, জামাইবাবু।

হাঁ—গানের আড্ডায় যাইতেছে, আজ তাহার আড্ডা দিবার দিনই বটে!

হাটুরে-নৌকা, ছইয়ের বালাই নাই। আট-দশখানা বৈঠা

পড়িতেছে, নৌকা যেন উড়িয়া চলিয়াছে। পাড়ের গাছপালা বাড়ি-ঘর-দোর অন্ধকারলিপ্ত নির্বাক নিস্তব্ধ প্রেতের মতো। এক-এক ঝাপটা বাতাস আসে আর জোনাকির ঝাঁক গাছের পাতা হইতে পিছলাইয়া খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক উড়িয়া বেড়ায়।

বদন ব্যাপারি বিশেষ ভদ্রতা করিয়া কহিল, আপনি আমাদের সঙ্গে বসে কষ্ট করবেন কেন বাবু? আপনি ভদ্দোরলোক, ঐ নুনের বস্তায় মাথা রেখে শুয়ে পড়ুন আরাম করে—

সরু বাঁশের মাচা, তার উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়া মানে একরূপ গোলাকার হইয়া পড়িয়া থাকা। হাত-দেড়েক পরিধির মধ্যে এই ভাবে আরাম করিতে করিতে অতুল ভাবিতে লাগিল, এই চোরের মতন পলাইয়া না আসিয়া শ্বশুরের নিকট সরাসরি যদি সে বিদায় চাহিত, তিনি কি বলিতেন?

যাও—কখনও বলিতেন না মুখে। বড় মিষ্টভাষী লোক। বছর বারো-তেরোর মধ্যে টিনের ঘর উঠিয়া এত বড় দোতলা কোঠাবাড়ি হইয়াছে, ঝাউগঞ্জের বাজারে আজ হৃষীকেশ হাজরার জুড়ি নাই, তুলসী মাড়োয়ারী এত করিয়া ইহার অর্ধেক খরিদ্দার জুটাইতে পারে না, সে কেবল ঐ মুখখানির গুণে।

সাত দিন অন্তর হাট, হাটুরে-নৌকা না থাকিলে স্টিমার-ঘাট অবধি হাঁটিয়া যাইতে হয়। অথবা নৌকা-ভাড়া বিস্তর। আজ না গিয়া যদি অতুল আর সাতটা দিন অর্থাৎ আগামী হাট-পর্যন্তই থাকিয়া যাইত এবং শ্বশুরকে বলিত, আমি বাড়ি যাচ্ছি—

হৃষীকেশ, যাও—কখনও বলিতেন না নিশ্চয়, তাঁহার সেই ছাত-বিদারণ হাসি হাসিতেন। ক্ষেপেছ বাবাজি? আর ক'টা দিন পরে রামনবমী···সেই সময় দোকানে একটু ইয়ে-টিয়ে হবে, তার আগে—

আর বার দুই-তিন বলিলে আমতা-আমতা করিতেন। এবং তারপরেও সহজে ছাড়িতেন না। কন্যা-দৌহিত্রীর নাম করিয়া

পুঁটুলি বাঁধিয়া কিছু মিষ্টি সঙ্গে দিয়া দিতেন। হয়তো কাপড়ও খান-তিনেক। এবং প্রায়ই যে-কথাটা বলিয়া থাকেন, যাইবার কালে হয়তো আর একবার তাহা শুনাইয়া দিতেন। নির্মলাকে নিয়ে আসব একবার—শ্রাবণ মাসে। তাকে বুঝিয়ে বোলো, ব্যস্ত না হয়।

শ্রাবণের পর শ্রাবণ পৃথিবীর অন্তকাল অবধি আসিবে, সুতরাং শ্রাবণ মাসের জন্য নির্মলার ব্যস্ত হইবার হেতু কি?

নীল আকাশের অগণিত নক্ষত্রমালা অতুলের মুখের উপর··· নৌকার নিচে ছলছলায়মান নদীজল···বৈঠার ছপাং ছপাং শব্দ··· ঘুমে অতুলের চোখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল। ব্যাপারিরা মাঝে মাঝে কথাবার্তা কহিতেছে···দশক্রোশ বিশক্রোশ দূর হইতে কাহারা যেন কি কহিতেছে···কত কি খাপছাড়া ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অতুল ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত থাকিতে থাকিতেই নৌকা ঘাটে লাগিল। এখান হইতে স্টিমারে তারপর ট্রেনে গিয়া সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি পৌঁছিতে হয়। বদন মাঝি ডাকিতে লাগিল, বাবু, বাবু!···বাবু নয়, যেন বাবু-দাদা। অতুল চোখ খুলিল। ভাবিয়াছিল, চোখ মেলিতেই এক চঞ্চল দুষ্ট শিশু কলহাস্যের তরঙ্গ তুলিয়া বলিয়া উঠিবে, বাবু-দাদা, রোদ উঠে গেছে, এখনো ঘুমুচ্ছ তুমি?

চোখ মেলিয়া দেখিল, রোদ উঠিবার অনেক বাকি, সবে পোহাতি তারা উঠিয়াছে।···মনে পড়িল, কালরাত্রে আট বছরের অভ্যস্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সে দোকান নাই, বাবু-দাদা বলিয়া ডাকিবে সে বুলু নাই—তাহাদের চিরদিনের মতো ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, আর ফিরিবে না।

স্টিমার আসিল দেরি করিয়া। অতুল ডেকের উপর কম্বল

বিছাইয়া সুস্থির হইয়া বসিল। বড় অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল—এ যেন ঠিক একখানা নাটক, আট বছরের অভিনয় শেষ করিয়া যবনিকা ফেলিয়া এখন সকালবেলা বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে।

আট বছর আগে ঝাউগঞ্জ আজকালকার মতো এ রকম ছিল না—এত আড়ত গুদাম লোকজনের হৈ-চৈ—কিছুই না। ভদ্রা নদীর উভয় পারে কেবল ফাঁকা মাঠ—এদিকে খানকয়েক গোলপাতার চালা। পূবদেশি বালামের নৌকা আসিয়া মাসের পর মাস ঘাটে লাগিয়া থাকে, দু-দশ মন করিয়া চাউল বিক্রি হয়। হৃষীকেশ এই সময়ে টিনের ঘর বাঁধিয়া চাউল কিনিয়া মজুত করিতে শুরু করিলেন। কাজ বাড়িল বিস্তর। কাজেই একটা মরশুম অন্তত আসিয়া দেখা-শুনা করিবার জন্য জামাইকে জরুরি খবর দিলেন।

সেই একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় ট্রেন ধরিতে যাইবার মুখে পান চিবাইতে চিবাইতে খুব গোপনে সে নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চিঠি দিও, কেমন?

প্রত্যুত্তরে নির্মলা ঘাড় নাড়িল দেখিয়া অতুল সহসা কথা বলিতে পারিল না। বলিল, লিখবে না চিঠি?

এমন সময়ে ডাক পড়িল, সেজ-বউমা!

অতুল তার পরেও দাঁড়াইয়া রহিল। কাজ সারিয়া নির্মলা নিশ্চয় আবার আসিয়া পড়িবে। কিন্তু রওনা হইবার আগে তার কাজ কিছুতেই মিটিল না। পথ চলিতে চলিতে অতুল ভাবিতে লাগিল, ও যেন কেমন এক রকম···পলাইয়া বেড়ায়—মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিল যে চিঠি দিবে না, বলিতে একটু মায়াও হইল না—আচ্ছা লোক!

ঝাউগঞ্জে তখন সোমবারে সোমবারে পিওন আসিত। একদিন চিঠি আসিয়াছে একেবারে খান তিন-চার। অতুল তখন গরুর গাড়ি হইতে ফর্দ মিলাইয়া মিলাইয়া মাল নামাইতেছে। আড়চোখে

তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। হৃষীকেশ চশমা আঁটিয়া চিঠিগুলি পড়িয়া গোছাইয়া পাশে রাখিলেন। খামের চিঠি একখানাও নাই।

রাত্রে দোকানের কাজ মিটিয়া গেলে সকলে ঘুমাইলে কেরোসিনের আলোয় সে নির্মলাকে চিঠি লিখিতে বসিল। শেষ হইল যখন অনেক রাত্রি। গাঙের ঘাটে নামিয়া ঠাণ্ডা জলে মুখ-হাত ধুইয়া বিছানায় শুইল। তবু ঘুম আর আসে না।

দিন-পনেরো পরে একদিন সকাল বেলায় হৃষীকেশ বলিলেন, বাবাজি, এই নাও—

রঙিন খাম, গন্ধে ভুর-ভুর করিতেছে। বেকুব পিওন কি-না হৃষীকেশের হাতেই দিয়া গিয়াছে! নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায় খামখানি বাঁ হাতে ধরিয়া ব্যাপারির সহিত অতুল যথাপূর্ব তর্ক করিতে লাগিল, হেঁ হেঁ—তাই বললে কি হয় ব্যাপারির পো? কামিনীভোগ ওর সাত জন্মে নয়, আমরা বুঝি চাল চিনি নে? দাম এক টাকা হিসেবে কম নিতে হবে—

একটু পরেই কাজ মিটাইয়া আড়ালে গিয়া খামখানি খুলিল। সবুজ কাগজ, তার উপর টকটকে রাঙা কালিতে ছাপা গোলাপগাছ, একটি মেয়ে, পাখি, কবিতা ইত্যাদি। কিন্তু কাগজ ও লেফাফার এত আড়ম্বর করিয়া যে কথা-কয়টা নির্মলা লিখিয়াছে, তাহা পড়িয়া অতুলের ইহাই কেবল মনে হইতে লাগিল—বৃথা সে রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া এত চিঠি লিখিয়া মরিয়াছে, একখানাও তার হাতে পৌঁছে নাই, পৌঁছিলে কি একটা কথার একটু রকমারি জবাব থাকিত না? হয় পোস্টাপিসে মারা গিয়াছে আর নয় টুনি কি বড়-বউদিদি···ছি ছি ছি, কি লজ্জার কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে! সে তাহাদিগকে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

আবার যখন হৃষীকেশের সামনে আসিল, তখন তিনি হিসাব

দেখিতেছেন। ইহারই মধ্যে একবার অতুলের দিকে নজর পড়িলে প্রশ্ন করিলেন, বাড়ির খবর সব ভাল? নিমু ভাল আছে?

বিয়ে তখন বেশি দিন হয় নাই। অতুল লজ্জায় শ্বশুরের সহিত মুখোমুখি উত্তর দিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

বেশ—বলিয়া হৃষীকেশ পুনশ্চ হিসাবের খাতায় মনঃসংযোগ করিলেন। পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলিলেন।

একটা কথা বলি-বলি করিয়া অতুল দাঁড়াইয়া রহিল। মনে এক-একবার জোর আনে, বলেই ফেলি না কেন—মেয়েমানুষ না কি? আবার ভাবে, উঁহু, ভাত খেতে খেতে বললেই হবে—সেই ভাল হবে—একেবারে এক্ষুণি বললে শ্বশুর-মশায় ভাববেন—দেখেছ, চিঠি পেয়েছে আর অমনি—

এমন কি অনেকক্ষণ গেল। সহসা মুখ তুলিয়া হৃষীকেশই কথা কহিলেন। কাছে ডাকিলেন, শোনো—

সলজ্জে অতুল কাছে আসিয়া বসিল। বহুদর্শী লোক, কথাটা প্রকাশ করিয়া না বলিতেই আন্দাজে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন।

হৃষীকেশ কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহা একেবারে অভাবিত। বলিলেন, তুমি রাহুত-মশায়ের সঙ্গে এই চালানে বড়বাজার যাও। মহাজনের সঙ্গে জানাশোনা হওয়া দরকার, পর-অপর দিয়ে কাজকর্ম হয় না—

বলিয়া একবার এদিক-ওদিক দেখিয়া লইলেন। তারপর খাতার একটা জায়গা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, দেখ একবার দিনে-ডাকাতি। পোস্তা থেকে পোল অবধি মুটে ভাড়া লিখেছে ছ-পয়সা—

পুনশ্চ একবার অধিকতর সন্তর্পণে চারিদিক দেখিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন, ঐ যে রাহুত-মশায় কি মধুসূদনকে দেখ, কম পাত্তোর কেউ নন। তোমায় শিখিয়ে দিই বাবাজি, মুখে ওদের খুব করে বলবে যে আপনারা হলেন হেন-তেন—ধর্মভারও দেবে—

কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় সর্বদা যেন কড়া নজর থাকে। ঐটে হল আসল। এবার থেকে বড়বাজারের গস্তো তুমি কোরো।

অতুল এইবার চোখ-কান বুজিয়া একরকম মরীয়া হইয়া বলিয়া বসিল, একবার দিন-দুই বাড়ি থেকে ঘুরে আসি—মানে মা ওঁরা বড় ব্যস্ত হয়েছেন কি না—

খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া হৃষীকেশ সহজ ভাবেই জবাব দিলেন, মায়ের প্রাণ, ব্যস্ত হয় না? বেশ—যেও বাড়ি। বেয়ানকে চিঠি লিখে দাও।

বলিতে বলিতে চুপ করিয়া গেলেন। পাতার মধ্যে আবার কোন দিনে-ডাকাতির সন্দেহ হইল বুঝি, মিনিটখানেক তাহারই সন্ধান করিলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন, যত জুয়োচোর-ফেরেব্বাজ নিয়ে কারবার—বাবাজি, তাই বলি তোমাদের জিনিস-পত্তর তোমরা দেখে-শুনে বুঝে নিয়ে আমায় ছুটি দাও, আমি বাঁচি। বারো ভূতে যে এত কষ্টের দোকান লুটেপুটে খাবে, কিছুতে প্রাণে সয় না। তুমি এসেছ না বেঁচেছি—

বুলু তখন জন্মে নাই, সন্তানের মধ্যে ঐ নির্মলা। নির্মলার আগেও ছেলে হইয়াছিল—প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে মোট চারিটি। কিন্তু হৃষীকেশের অদৃষ্টে চারিটি ছেলেই গিয়াছে, গিন্নিরাও গিয়াছেন। তৃতীয় পক্ষ অবশ্য ঘরে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ছেলেপিলে না হইবার মতো অবস্থা। অতঃপর এ বয়সে হৃষীকেশের আর চতুর্থ পক্ষে ইচ্ছা নাই।

অতুল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। ইতিপূর্বে বেয়ানকে চিঠি দিবার প্রসঙ্গ হইতেছিল, তাঁহাকে চিঠিতে কোন্ তারিখের উল্লেখ করিবে, কাল—পরশু—না শনিবার সেটা সঠিক না জানিয়া স্বস্তি পাইতেছিল না। হৃষীকেশ কিন্তু ক্রমাগত হিসাব উল্টাইয়া চলিয়াছেন, বোধ করি বা পুত্র-ব্যাকুলা বেয়ানের কথা তাঁহার মনেই নাই।

অবশেষে অতুলই মনে করাইয়া দিল। তা হলে মাকে চিঠি লিখে দিই ?

মুখ তুলিয়া হৃষীকেশ জামাতার দিকে চাহিলেন।

হ্যাঁ, লিখে দাও। মরশুম অন্তে আশ্বিন-কার্তিকের দিকে হপ্তাখানেকের জন্য যেও বাড়ি। দিন সাতেক—সে আমি এক রকম করে চালিয়ে নেব। কি আর হবে ? তা বলে কি আর বাড়ি-ঘরে যাবে না ?

এত বড় সুব্যবস্থার পরে অতুলের আর কথা বলিবার জো রহিল না।

হৃষীকেশ বলিতে লাগিলেন, তাই লিখে দাওগে যাও। তারপর—জামাতার মুখের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিয়া সুর অতিশয় কোমল করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, বাড়ি-ঘর-দোর রইলই,—যাচ্ছে কোথা ? এই উঠতি-গঞ্জে আমাদের এখন একচেটে কারবার। দশটা বছর সবুর কর দিকি। দশ বছরে ভেল্কি খেলে যাবে। বাড়ি গিয়ে তখন টাকার বিছানা করে শুয়ে থেকো। সম্ভাবিত ঐশ্বর্যের আনন্দে হৃষীকেশের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। বলিলেন, বিকেলে চিটেগুড়ের নৌকো আসবে, বিকেলেই গুদোমজাত হবে—মনে থাকে যেন, বাবাজি।···

সেই দশ বছর এখনও পুরে নাই, বছর দুই বাকি আছে। কিন্তু ভেল্কিবাজির মতোই ঘটিয়া গিয়াছে বটে! দেখিতে দেখিতে হৃষীকেশের টিনের ঘর গিয়া পাকা দালান-কোঠা হইয়া গেল। দোকানের পিছনে ঘেরা-কম্পাউণ্ডে তৃতীয় পক্ষের শাশুড়ির অধিষ্ঠান হইয়াছে। হইবে-না হইবে-না করিতে তাঁহার কোল জুড়িয়া সোনার মতো ছেলে বুলু হইয়াছে। অতুলের সহিত বুলুর ভাবটা কিছু বেশি। রোজ ভোরবেলা উঠিয়াই চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে—বাবু-দাদা! দোকানের মাচায় উঠিয়া কখনও কখনও সে

লজেঞ্চুস চুরি করিতে যায়, পিরোনাথ কি মধু ধরিয়া ফেলিলে চিৎকার করিয়া ওঠে, বাবু-দাদা গো—

অতুলের পরমশত্রু ঐ বুলু! ঐ এক ফোঁটা অবোধ বালক তার আট বছরের স্বপ্ন ভেল্কিবাজির মতো উড়াইয়া দিয়াছে। আট বছর পরে সে বাড়ি ফিরিয়া চলিয়াছে—টাকার বিছানা পাতিয়া শুইয়া থাকিবার জন্য নয়। পকেট ও তোরঙ্গ হাতড়াইলে আজ সাত টাকা এবং কয়েক আনার পয়সা যদি বাহির হয় মোটের উপর।...

স্টিমারে উঠিয়াই অতুল লক্ষ্য করিয়াছিল, পার্শ্ববর্তী জনকয়েক সহযাত্রী পরস্পর খাসা সদালাপ জমাইয়া বসিয়াছেন। আপনার ভাবনাতেই ছিল, কোনদিকে এতক্ষণ সে মনোযোগ করে নাই। সহসা সভয়ে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—ভদ্রলোকদের আলাপ-আলোচনা সম্প্রতি তর্কে পৌঁছিয়াছে, একেবারে যাহাকে বলে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ব্যাপার। একজনে একখানা উপন্যাস হাতে লইয়া ভীমবিক্রমে প্রতিপন্ন করিতেছেন, ইহার মতো বই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই। অপর পক্ষও চুপ করিয়া নাই। ফলে সমালোচনা এইরূপ চূড়ান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে ঠিক ইহার পরেই ছড়ি ও ছাতাগুলির দরকার পড়িবার কথা। চারিদিকে যাত্রীর ভিড়—তবু উহারই মধ্যে যা-হোক করিয়া কম্বলটা একটু বিছাইয়া লইয়া সামনে তোরঙ্গ রাখিয়া অতিশয় সতর্কভাবে অতুল তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিল। অর্থাৎ ক্রিয়া আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা অন্তত সারেঙের ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবে, তারপর ঐ তোরঙ্গ ও নিজের অপরাপর অঙ্গের ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক।

পরক্ষণে তাকাইয়া দেখিল, ইঞ্জিনের কাছাকাছি জায়গাটায় লোকজন বসে নাই, একেবারে খালি, বোধ করি উত্তাপ বেশি বলিয়া। কিন্তু ইঞ্জিনের উত্তাপে মানুষ মরে না। অতএব স্থান পরিবর্তন করিয়া অতুল সেখানে গিয়া শান্তিতে কম্বল পাতিল।

মাঝে একবার নিচে গিয়া খালাসিদের দড়ি-বাঁধা বালতি চাহিয়া গাঙের নোনাজলে আরাম করিয়া স্নান করিল। ভেণ্ডারের নিকট মিলিল বাতাসা ও বাসি-পাঁউরুটি। তাই কিছু কিনিয়া খাইয়া পরম পরিতোষে শুইয়া পড়িয়া স্টিমার-চলার শব্দ শুনিতে শুনিতে মনে পড়িল, তোরঙ্গের মধ্যে তাহার সঙ্গেও খানকয়েক উপন্যাস আছে, কাল রাত্রে বাক্স গোছাইতে গোছাইতে নজরে পড়িয়াছিল বটে!

খোঁজ করিয়া পাওয়া গেল খানকয়েক নয়—একখানি মাত্র উপন্যাস, নাম কুঙ্কুমকুমারী। তোরঙ্গের তলায় কতদিন হইতে পড়িয়া আছে, তার ঠিক নাই—পাতা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। খানিকটা পড়িয়া বুঝিতে পারিল, এ বই তাহার পড়া। পাতা কয়েক উল্টাইয়া সেই জায়গায় আসিল, চমৎকার জায়গা, ঘটনাটা অতুলের বেশ মনে আছে—কুঙ্কুমকুমারীর অসুখ করিয়াছে, পোষা পায়রা উড়াইয়া দিয়া রাজকুমারী খবর পাঠাইয়াছেন, জয়ন্তলাল নদী ঝাঁপাইয়া মাঠ দিয়া বন দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন···

এখানে-সেখানে আরও খানিক চোখ বুলাইয়া অতুল বইখানা রাখিয়া দিল। এককালে তার কেবল দুইটি নেশা ছিল—নবেল পড়া ও গান-বাজনা। তৃতীয় নেশা জুটিল নির্মলার সহিত বিবাহ হইবার পর। দোকানে ঢুকিয়া অবধি রোকড় লিখিতে লিখিতে সে-সব কবে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া গিয়াছে!

বই রাখিয়া দিয়া অতুল নির্মলার পুরানো চিঠি দু-চারখানা যাহা পাইল, বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। শেষাশেষি এই ধরনের যে-সব চিঠি আসিত তার কতকগুলির উত্তর দেওয়া হয় নাই, ভাল করিয়া পড়িয়াই দেখে নাই। কাজকর্মের মধ্যে খাম ছিঁড়িয়া খুঁজিয়া-পাতিয়া নিচের দিক হইতে আগে দেখিয়া লইত, শারীরিক কে কেমন আছে, তারপর আবার খামে ভরিয়া চাটাইয়ের নিচে বা বেনিয়ানের পকেটে রাখিয়া দিত, রাত্রিবেলা নিরিবিলি পড়িয়া

দেখা যাইবে। কিন্তু সে আর ঘটিয়া উঠিত না। ইদানীং নির্মলা চিঠিপত্র বেশি লেখে না। যা লেখে তা-ও এ ধরনের একেবারে নয়। তিনটি মেয়ে হইয়াছে, তাহাদের কথায় আজকালকার চিঠি ভরতি, তাহাদের জন্য এটা দরকার, সেটা দরকার ইত্যাদি।

অনেক দিন আগে—সেই সব নূতন বয়সের কথা—একটা চিঠি লইয়া দুর্বিনীতা নির্মলা স্বামীকে যা অপমান করিয়াছিল দশজনের মধ্যে তাহা বলিবার কথা নয়। অতুল সকৌতুক স্নেহে তাহাদের প্রথম যৌবনের সেই ছেলেমানুষি-ভরা দিনগুলি ভাবিতে লাগিল। হৃষীকেশ একবার তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন মাল কিনিতে। অতুল সটান চলিয়া আসিল বাড়ি। রাহুত-মহাশয়ের সহিত গোপন ষড়যন্ত্র হইল, দুই দিন মাত্র বাড়ি থাকিয়া মঙ্গলবার সকালে বড়বাজার গদিতে তাঁহার সহিত দেখা করিবে।

দিনের মধ্যে দুপুর বেলাটায় নির্মলার একটুখানি যা অবসর। পুরুষ-মানুষদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, বউরা সবে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে, এমন সময় অতুল ঘুরিয়া রান্নাঘরের সামনে দিয়া জুতা মসমস করিতে করিতে গম্ভীর মুখে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। গানের আড্ডায় নিশ্চয়। নির্মলা দুপুরে ঘুমায় না, এ ঘরে আসিয়া কাঁথার ডালা লইয়া বসিল।

কতক্ষণ এমনি আপনার মনে সেলাই করিতেছে, খেয়াল নাই, হঠাৎ অতুল ঢুকিল। ভয়ানক ব্যস্ত। কোনদিকে না তাকাইয়া সোজা আসিয়া টেবিলের জিনিসপত্র নাড়াইয়া-সরাইয়া খুব ব্যস্ত-ভাবে কি খুঁজিতে লাগিল।

ছোট্টঘরে দুইটি প্রাণী, একজনে গভীর মনোযোগের সহিত সেলাই করিয়া চলিয়াছে, আর একজন টেবিল, টেবিলের তলা, আলমারির মাথা—সমস্ত জায়গা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ভাবখানা যেন ইহজন্মে ইহাদের দু'টির পরিচয় নাই।

নির্মলা মনে মনে ভাবিল, আর কাজ নাই। মুখ তুলিয়া বলিল, আড্ডা জমল না?

নিদারুণ বিরক্তি-ভরা মুখে অতুল একবার তাকাইয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

নির্মলার কিন্তু গ্রাহ্য নাই, বসিয়া বসিয়া টিপি-টিপি হাসিতে লাগিল। আবার কহিল, এখনও সন্ধ্যে হয় নি, ফিরে এলে যে বড়...ওগো শুনতে পাচ্ছ?

কি বলছ?

বলছি, বড্ড গরম আজকে। বলিয়াই প্রগল্‌ভ হাসি।

অতুল রুখিয়া উঠিল, ও-ঘরে মা রয়েছেন, ঐ রকম হেসে উঠতে লজ্জা করে না? বুড়ো হয়ে দিন দিন বুদ্ধি বাড়ছে!

যেন ভারি ভয় পাইয়া গিয়াছে এমনি ভাবে শিহরিয়া কাঁপিয়া নির্মলা কহিল, সর্বনাশ, বুড়ো হয়েছি নাকি? না—না—বুড়ো এখনও হই নি একেবারে, হয়েছি? বল। বুড়ো হবার কথা শুনলে বড্ড ভয় করে—এই পাকা চুল, থুত্থুড়ে, মাগো—যা বিচ্ছিরি—

বলিতে বলিতে সে অতুলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সর—কি খুঁজতে হবে বল দিকি। জামার বোতাম? এই যে তোমার জামায় লাগানো রয়েছে—দেখতে পাও না?

অতুল কহিল, বড্ড ফাজিল হয়েছ তুমি। বোতাম খুঁজছি—বোতাম ছাড়া আর কিছু বুঝি খোঁজা যায় না?

বধূ পরম বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বোতাম নয়—তবে? ও—আমাকে। আমি তা বুঝতে পারি নি। আমি আলমারির মাথায় থাকি নে কি না—

ভারি অহঙ্কার! তোমায় খুঁজতে বয়ে গেছে আমার। শোন নির্মলা—

বলিয়া অতুল বিছানায় চাপিয়া বসিল। বলিতে লাগিল, শোন, তোমায় বলে দিচ্ছি স্পষ্ট করে, কিছু দরকার নেই তোমাকে। কেন, কিসের এত? বাড়ি আমি কিছুতে আসতাম না, নেহাৎ মাঁর জন্যে মনটা কেমন হল।...সকালবেলা বাড়ি এসেছি, এই সারাটা দিন কি করে বেড়াও শুনি?

ক্লিষ্ট কণ্ঠে নির্মলা কহিল, বড্ড গরম, মরে যাই। তুমি থাম।

অতুল আরও রাগিল।

যেখানে ঠাণ্ডা সেইখানে চলে যাও, ধরে রাখছে কে?

তাই যাই—বলিয়া সত্যসত্যই চলিল। দরজা অবধি গিয়া হঠাৎ গাম্ভীর্যের মুখোস ফেলিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গেলাম আর কি! তুমি বকলে আমার মোটে রাগ হয় না, কি করব?

খানিক পরে অতুলের একখানা হাত তুলিয়া লইয়া স্নিগ্ধ মায়া-বিগলিত কণ্ঠে নির্মলা বলিল, এবারে আর গরম নেই, বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে—না?

অতুল ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইয়া বলিল, যাও, যাও—তোমায় খুব চিনেছি—এই তিন মাসের মধ্যে—

ফের? বলিয়া নির্মলা তাড়া দিয়া উঠিল। তারপর স্বামীর মুখের দিকে দু'টি চোখের স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, রাগ তোমার পড়বে না আজ?

অতুল বলিতে লাগিল, রাগের বড় দোষ কি-না! এই তিন মাসের মধ্যে ক'খানা চিঠি দিয়েছ জিজ্ঞাসা করি?

তাই কি মনে থাকে?

অতুল ভ্রূভঙ্গি করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। মনে থাকে না! সেই তো বলছি, ঘষে মেজে রূপ আর ধরে বেঁধে—

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া নির্মলা ফিক-ফিক করিয়া হাসিতে লাগিল। শেষে আর চাপিতে পারিল না। শোন—শোন—বলিয়া হাত দিয়া স্বামীর মুখ ফিরাইয়া ধরিল। এদিকে ফেরো, শোন না গো, টুনি বলে কি—

সন্ত্রস্ত হইয়া অতুল কহিল, আমার চিঠিপত্তোর টুনি ওরা কেউ দেখে নি তো?

নির্মলা কহিল, না, দেখে নি আবার! তোমার বোন তেমনি কি-না—না দেখে ছাড়ে? কি লজ্জা মাগো, তুমি যত ছাইভস্ম লিখতে···ও আমার কি নাম বের করেছে শুনবে?

বলিয়া নির্মলা আবার হাসিতে লাগিল। তারপর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, বলে—প্রাণপ্রেয়সী দেখনহাসি···সব তোমার দোষ।

বলে না কি? বলিয়া রাগ ভুলিয়া অতুল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, দোষ আমার, তা সত্যি। কিন্তু নির্মলা তোমার কোন চিঠিতে কোন দিন কেউ এক ফোঁটা দোষ ধরতে পারে নি।

নির্মলা সকৌতুকে স্বামীর দিকে স্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, দুষ্টু, আমার চিঠি হাটে-ঘাটে পড়িয়ে বেড়াতে তুমি?

অতুল কহিল, না হাটে-ঘাটে আর কি—রাহুত-মশায় ওঁদের পড়তে দিতাম। পাকা লোক, এর আগে বিশ বছর জমিদারি এস্টেটে মুহুরিগিরি করেছেন। তোমার চিঠি পড়ে বলতেন—চমৎকার, যেন পিতামহ ভীষ্মদেব লিখছেন। বলিয়া জামার পকেটে যে-একখানা চিঠি ছিল, সমালোচনা করিবার জন্য সেইটা বাহির করিয়া আনিল। আনিতেই নির্মলা ফস করিয়া কাড়িয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল।

দেখলে দোষের কিছু?

ছাপা কবিতা দু-লাইনের উপর আঙুল রাখিয়া মুখের অপরূপ ভঙ্গি করিয়া নির্মলা বলিল, পড়তে জান গবচন্দোর? বুঝতে পার? বলিয়া অতুল কোন কিছু দেখিবার আগেই তৎক্ষণাৎ চিঠি মুড়িয়া পাকাইয়া লুকাইবার আর কোন নিরাপদ স্থান না পাইয়া একেবারে গালের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

রাগ যা পড়িয়া গিয়াছিল, মুহূর্তে আবার দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

যা তা বোলো না বলছি। তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে—স্বামী গুরুজন নয়?

বলিয়া অবমানিত অতুলচন্দ্র মহা ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।···

অতুলের ভাবনা ভাসিয়া গেল হঠাৎ স্টিমারের বাঁশীর শব্দে—বারংবার তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজিতেছে। ছোট্ট একখানা নৌকা—যেন মোচার খোলা একখানি—স্টিমারের ঠিক সামনে পড়িয়া গিয়াছে। সবাই 'গেল' 'গেল' করিয়া উঠিল। কিন্তু নৌকা বাঁচিয়া গেল, তরঙ্গের দোলায় দুলিতে দুলিতে অতি অবহেলায় পাশ কাটাইয়া খালে ঢুকিল। নদীকূলে শ্যামল গোলঝাড়, দিগন্তবিসারী বিল, মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে তাল নারিকেল ও অন্যান্য গাছপালার ছায়ায় গ্রাম। দেখিতে দেখিতে অমনি একটা গ্রামের মধ্যে স্টিমার চলিয়া আসিল। জেলেডিঙ্গি দুলিতেছে, জেলেরা জাল ফেলিয়া তার উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে···এক ঝাঁক গাঙ-চিল যেন স্টিমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়া উড়িতেছে। বাঁকের মুখে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে জল কাটিয়া স্টিমার চলিয়াছে—খুব জোরে চলিয়াছে—গাঙ-চিলের ঝাঁক কোথায় পড়িয়া রহিল—কত বিল, কত গ্রাম, কত ঘাট, রাখালছেলে, ঘোমটা-ঢাকা স্নানরতা গ্রাম্য-বধূ···

অতুল ভাবিল, এই তো যাইতেছে—যদি গিয়া দেখে খুকিদের কারও অসুখ করিয়াছে···কিংবা শোনে, তাদের মা কাল হঠাৎ ঘাটের

সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া···মানুষের জীবনে কিছুই বিচিত্র নয়। আচ্ছা, নির্মলা কাজ-কর্ম সারিয়া এখন দুপুরে কি করিতেছে?···এক মজা করিলে হয়, একটু ঘুরিয়া ডাক্তারখানা হইয়া সেখানে কম্পাউণ্ডার-বাবুর সহিত ঘণ্টা-দুই গল্পগুজব করিয়া অনেক রাত্রে চারিদিক নিশুতি হইয়া গেলে আজ নির্মলার জানলায় গিয়া ঘা দিতে হইবে, চাপাগলায় ডাকিতে হইবে, সেজ-বউ, সেজ-বউ! গলা শুনিয়া বুঝিতে পারিবে কি? বুঝিলেও বিশ্বাস হইবে না।

নির্মলার চিঠির একখানা তখনও বাহিরে খোলা পড়িয়া ছিল, বাক্সে তোলা হয় নাই। অতুল পরম যত্নে উহা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিল। অকস্মাৎ প্রথম যৌবনের সেই সব বিগত স্বপ্ন তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। মনে হইতে লাগিল, চিঠির কাগজের পাখি নয়—আসল পাখি। উপন্যাসের কুঙ্কুমকুমারীর মতো একদা এক কিশোরী ঐ পাখিদের মুখে বার্তা পাঠাইয়া দিত—যাও পাখি বোলো তারে—সে কতকাল আগে! আর দূর দুর্গম দেশে দোকানঘরে পাট ও চালের বস্তার আড়ালে আবডালে অতুল বসিয়া বসিয়া রোকড় লিখিত, পাখি সেখানে পৌঁছিতে পারিত না। আট বছর পরে উড়িতে উড়িতে পাখি আজ এই সকালবেলা তাহার কাছে পৌঁছিয়াছে। সে ছুটিয়া চলিয়াছে নদী পারাইয়া, এই সব বিল-মাঠ-গ্রাম ভেদ করিয়া—কোন ছায়াঘন নির্জন গ্রামের ধারে তার কুঙ্কুমকুমারী এখনও চুপ করিয়া চাহিয়া আছে, চোখে তাহার পলক পড়িতেছে না!

লাল কালিতে বটতলার অপরিষ্কার ছাপা বাজে চিঠির কাগজ, এক পয়সায় আটখানি করিয়া বিক্রি হয়। সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাগজের অতি সাধারণ পাখি, মেয়েলোকটি এবং তাহার মুখের কবিতা দু-লাইন দেখিতে দেখিতে অতুলের কাছে জীবন্ত হইয়া উঠিল।

পথে অতুল কোথাও দেরি করিল না, তবু বাড়ি পৌঁছিতে রাত্রি

একটু বেশি হইল। মা ও পিসিমা উঠিয়া আসিলেন। নির্মলা আবার রাঁধিতে রান্নাঘরে ঢুকিল। একবার একটুখানি মাত্র চোখা-চোখি হইল, মুখে তাহার আনন্দের দীপ্তি।

তারপর ঘরে ঢুকিয়া জানলা খুলিয়া অতুল বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল। ঝির-ঝির করিয়া হাওয়া দিতেছে, প্রদীপের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতেছে, খুকি তিনজন ঐ খাটে বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। বাহিরে জানলার ওধারে লতাপাতার খসখস শব্দ, বুনোফুলের গন্ধ, কালো অন্ধকার, .. সমস্ত মন তাহার অপরূপ স্নিগ্ধতায় জড়াইয়া গেল। এ জগতে কেউ যে তাহার উপর অন্যায় অবিচার করিয়াছে, স্টিমার ও রেলে আজ তাতিয়া পুড়িয়া সারাদিন না খাইয়া এত পথ চলিয়া আসিয়াছে, সমস্ত ভুলিয়া নিশ্চিন্ত আরামে চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল।

একেবারে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তারপরে ঘুম—এখন নয়। ঘুম তাড়াইবার জন্য অতুল ও-বিছানায় গিয়া বসিল, ঘুমন্ত ছোট খুকির গালে—যেন না জাগে এমনি সন্তর্পণে একটি চুমা খাইল। হাসি একেবারে মেজটির ঘাড়ের উপর পা চাপাইয়া দিয়াছে, জানলা দিয়া হাওয়া আসিয়া অগোছাল চুল উড়িতেছে। ঘুমাইয়াছে--তবু মুখের উপর কেমন যেন করুণ একটা ভাব। মেয়ে দু'টিকে অতুল ঠিক করিয়া শোয়াইয়া দিল। তারপর রান্নাঘর হইতে ডাক আসিল।

ভাত দিয়া নির্মলা মৃদু হাসিয়া কহিল, হঠাৎ যে বড়?

হাসিমুখে অতুল কহিল, তোমার চিঠি পেয়ে।

নির্মলা অবাক হইয়া গেল। চিঠি? চিঠি লিখলাম কবে? না আমি লিখি নি তো।

লিখেছ, লিখেছ গো—সেই যে সব লিখতে—বলিয়া অতুল ভালবাসা-ভরা দুটি চোখের দৃষ্টি নির্মলার মুখে রাখিয়া বলিতে লাগিল, বুঝলে নির্মলা, স্টিমারে বসে বসে সেই আমলের চিঠির

খানকয়েক পড়ছিলাম আজ। আর কোন দিন এমন করে পড়ে দেখি নি। কি মনে হল, শুনবে ?

আনন্দোচ্ছল স্বরে নির্মলা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না-না, রক্ষে কর মশাই, শোনাতে হবে না। সেই সব ছাইপাঁশ আজও পুঁজি করে রেখেছ বুঝি ?

বলিয়া চঞ্চলা হরিণীর মতো লঘুপদে ও-ঘরে চলিয়া গেল।

উঠে পোড়ো না যেন—দুধ আনতে যাচ্ছি, খুকী আজ আর দুধ খাবে না—সব দিন খায় না—

দুধ গরম করিতে করিতে নির্মলা কহিল, সত্যি, ঠাট্টা নয়—কলকাতায় মাল কিনতে যাচ্ছ ? ক'দিন থাকবে বাড়ি ?

অনেক—দিন।

কত দিন ? এক মাস ? এক বচ্ছর ?

অতুল কহিল, যতদিন বাঁচব, ততদিন। তোমাদের ফেলে রেখে আর কক্ষনো কারও গোলামি করতে যাচ্ছি নে, নির্মলা। প্রাণপাত করে খাটলাম আর এতকাল পরে শ্বশুর-মশায় এই বললেন—

মুখ দেখিয়া নির্মলা বুঝিল, সে ঠাট্টা করিতেছে না। একটি একটি করিয়া অতুল দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল। শুনিয়া নির্মলার হাসি নিভিল, সে গুম হইয়া রহিল।

কথা শেষ করিয়া অতুল কহিল, শুনলে তো সব, বল এইবার—

ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া নির্মলা বলিল, ভাল কর নি—

কেন ?

বাবা কি অন্যায়টা বলেছেন যে রাগ করে চলে এলে ? একাশি টাকার কি দিয়ে কি করলে তার হিসেব চাইবেন না ? একটু অপেক্ষা করিয়া উত্তর আসিল না দেখিয়া নির্মলা আবার বলিতে লাগিল, চিরটা কাল তোমার ঐ এক ভাব। তখনও যেমন, এই আধবুড়ো

কালেও তেমনি। তিনটে মেয়ে হয়েছে, একবার পরিণামটা ভাব? অত মান নিয়ে থাকলে ঘর-সংসার চলে না।

ততক্ষণে শেষ গ্রাস মুখে পুরিয়া অতুল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তারপর কাজকর্ম সারিয়া এ ঘরে আসিয়া একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থায় নির্মলা পুনশ্চ দীর্ঘ ছন্দে শুরু করিল, শোন, দেমাক করে চলে তো এলে—এখন ঘরে চতুর্ভুজ হয়ে বসে থাকবে না কি? তিন তিনটে মেয়ে, একটা এই সাতে পা দিয়েছে। কালই চলে যাও, নরম হয়ে বাবার হাতে-পায়ে ধর গিয়ে—বলগে, রাগের মাথায় যা লিখেছি—লিখেছি···ও কি ঘুমুচ্ছ যে।

ডাকিয়া গায়ে নাড়া দিয়া কিছুতে আর অতুলের সাড়া পাওয়া গেল না।

অতুল তখন স্বপ্ন দেখিতেছে—সেই স্টিমারে বসিয়া যা-যা নাবেলে পড়িয়াছে তাই। যেন জয়ন্তলালের কাছে পায়রা আসিয়া পৌঁছিয়াছে···বনবাদাড় ভাঙিয়া রাজপুত্র ছুটিয়াছে···ছুটিতে ছুটিতে কতকাল গেল, পথের আর অন্ত নাই···অবশেষে রাজবাড়ি যখন পৌঁছিল তার আগে কুঙ্কুমকুমারী মরিয়া গিয়াছে।

দীর্ঘ দিনের পরে ফিরিয়া আসিয়া রাজপুত্র প্রিয়তমার শবের পাশে আছড়াইয়া পড়িল।